ঘর হতে আঙিনা বিদেশ : বঙ্গিমহিলাদের ভ্রমণকথা

সুদক্ষিণা ঘোষ

।। এক।।

> সমুদ্র দেখিব না আমি?
> বিশাল বিরাট সীমাহীন সমুদ্র। দেখব না তুষার ঢাকা মহিমা?
> দেখব না এই পৃথিবীর রন্ধে রন্ধে কত রঙ কত রহস্য কত লীলা!
> চারখানা দেওয়াল ঘেরা ছোট্ট একটা খুপরির মধ্যে দম আটকানো বুক নিয়ে শুধু দিন আর রাত্রির মালা জপে যাব আমি...?
> ...আমার মার মত, মাসিদের মত শুধু জীবনটাকে কাটিয়ে যাব? কারণহীন উদ্দেশ্যহান অর্থহীন সেই জীবনটার বোঝা তাহলে বইব কী করে?

কিশোরী এক মেয়ে এমনিভাবে ভেবেছিল একদিন, সে-কিশোরীর জন্ম হয়েছিল আশাপূর্ণা দেবীর কলমে, ১৯৬৩ সালে; বেগবতী নামে তাঁর তত-পরিচিত নয় উপন্যাসের পাতা থেকে উঁকি দিয়ে যায় বিশাখা নামে আশ্চর্য সেই কিশোরীটির ঝলমলে মুখ, পথে চলাই যার নেশা, পথে পথেই ছড়ানো যার ঘরের ঠিকানা।

বিশাখার মতে কেবল পথের নেশায় এমন পথ চলার জন্য নয় হয়তো, তবু উপন্যাসের পাতায় বিশাখার জন্ম নেওয়ার অনেকদিন আগেই দেখি, বাংলাদেশের নিছকই অবরোধবাসিনী মেয়েদের ঘরের শিকড়ে লেগেছে ডানার উড়াল, ঘরের আঙিনা ছাপিয়ে বেরিয়ে পড়ার সেই আনন্দস্বাদ ঝর্ণা হয়ে ঝরে পড়েছে তাদের কলমের রেখায় রেখায়।

তবু, সংখ্যায় তারা কজন আর? এই তো ক'দিন আগে মায়াসুন্দরী নামে এই মেয়েদেরই একজন ভারি আক্ষেপ করে লিখেছিল ঘরের মাঝে মেয়েদের বন্দীজীবনের কথা, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া বাইরের পৃথিবীটাকে ছুঁয়ে আসা দূরে থাক, কলকাতা শহরের বুকে দাঁড়িয়ে তার নতুন সৃষ্টি হাওড়ার পুলটাকে দু'চোখ ভরে দেখা, এটুকু সাধও মিটবার উপায় কোথায় অভাগা মেয়েদের! 'বঙ্গমহিলা' পত্রিকায় ১২৮২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যার পাতা উল্টলে আজও চোখে পড়ে মায়াসুন্দরীর সেদিনের ক্ষুব্ধ উচ্চারণ।

> স্ত্রীলেকের কিছু দেখিবার হুকুম নাই। কলিকাতায় গঙ্গার উপর পুল নির্মাণ হইল, লোকে কত তাহার প্রশংসা করিল, কিন্তু আমাদের শোনাই সার হইল, একদিনও চক্ষুবর্ণের বিবাদভঞ্জন করিতে পারিলাম না।

কেবল এইটুকুই অবশ্য লেখেনি মায়াসুন্দরী, লিখেছিল নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা, বাল্যবিবাহের কুফুলের কথা, লিখেছিল স্বকালের সমাজে পুত্র আর কন্যার বৈষম্যের কথাও। এমন আরো কত ছোটো ছোটো আকাঙ্ক্ষা আছে নারীজীবনের, আছে আরো কত ছোটো ছোটো সাধ! এই সব আকাঙ্ক্ষা, এই সব সাধ বুকে নিয়ে কত ব্যথায় ব্যথায় পা ফেলে শুরু হলো মেয়েদের পথ চলা।

উনিশ শতকে দিকে ফিরে চাইলেই তো এমন চোখে পড়ে যায়, মেয়েদের জগতের অনেকখানি নিকষ আঁধারে কয়েকটি আলোকরেখার ইশারা, আলোয়-হাওয়ায়-গন্ধে-রঙে বাইরের জগৎ যে কেমন করে উজাড় করে দেয় তার রূপের ডালা, কেমন করে যে চেনা হয়ে ওঠে অচিন দেশের মানুষ, অন্তঃপুরচারিণী মেয়ের কাছে সে তো এক রহস্যই সেদিন! তাই কি এমনি করে হাতে কলম তুলে নিতে সাধ যায় উনিশ শতকের সেই মেয়েদের, অনেক সুখে অনেক দুখে আলোয় হাওয়ায় মাখামাখি বাইরের জগৎখানি ধরা দিয়েছে যাদের চোখে, অদেখা পৃথিবী তার রহস্য-অবগুণ্ঠনখানি খুলেছে যাদের সামনে?

।। দুই।।

অনেক সুখে অনেক দুখেই জগতের আনন্দযজ্ঞের পাত্রখানি ছুঁয়ে আসতে হয়েছে মেয়েদের, চলতে হয়েছে এমন ব্যথায় ব্যথায় পা ফেলেই, উনিশ শতকের বাঙালি মেয়েদের। নয়তো, স্বামীর সঙ্গে বিলেত পাড়ি দেওয়ার অপরাধে কোন্ মা-কে আর হারাতে হয় শিশুকন্যাটিকে ঘিরে তাঁর সমস্ত অধিকার? এমনটাই তো ঘটেছিল কৃষ্ণভাবিনী দাসের জীবনে, প্রথম বাঙালি নারী, সাগর পাড়ি দিয়ে এসে কলম তুলে নিয়েছিলেন যিনি হাতে, লিখেছিলেন ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা। ইতিহাসের তথ্য বলে, মায়াসুন্দরীর আক্ষেপের উচ্চারণ পাঁচ বছর পুরানো হতে না হতেই স্বামীর সঙ্গিনী হয়ে ইংলন্ডে পৌঁছেছিলেন, কৃষ্ণভাবিনী, ১৮৮২ সালে।

মনে হতেই পারে আজকের পাঠকের, বিলেত যাওয়ার কারণে এমন নিষ্ঠুর দণ্ড ভোগ করতে হলো কেন কৃষ্ণভাবিনীকে, এমন তো নয় যে বাঙালি মেয়েদের মধ্যে তিনিই প্রথম গিয়েছিলেন ইংলন্ডে; কৃষ্ণভাবিনীর আগেই তো বিদেশযাত্রা করেছেন কমলমণি ঠাকুর, অরু দত্ত-তরু দত্ত কিংবা রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বঙ্গমহিলারা, স্বামী সত্যেন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্রের সঙ্গিনী হয়ে বোম্বাই গেছেন ঠাকুরবাড়ির বধূ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, দুটি শিশুসন্তান নিয়ে একলাই সাগরপাড়ি দিয়ে পৌঁছেছেন বিলেতে, স্বামীর কাছে; তবে বঙ্গমহিলা হলেও, কৃষ্ণভাবিনীর সঙ্গে কিছু প্রভেদ তো তাঁদের ছিলই।

এক মস্ত প্রভেদ তো এইটাই যে, কৃষ্ণভাবিনীর এইসব বিখ্যাত পূর্বগামিনীদের পারিবারিক পরিমণ্ডল

জুড়ে কোথাও না কোথাও ছিলই আধুনিক শিক্ষা বা আধুনিক মনোভঙ্গির অনুকূল আবহাওয়া, আর স্বামীর ঔদার্য ছাড়া আর কোনো সুযোগই আসেনি কৃষ্ণভাবিনীর জীবনে; তবুও, ঠিক কিন্তু কথাটাও যে, এত অনুকুল আবহাওয়া সত্ত্বেও, পূর্বগামিনী ওই বঙ্গ মহিলার কেউ এর আগে কলম তুলে নেননি হাতে, কৃষ্ণভাবিনীর মতো এমন করে উত্তরকালের বাঙালি পাঠকের হাতে নিজেদের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়টুকু তুলে দেওয়ার কথাও ভাবেননি তাঁরা কেউই।

তবে এতটাই রক্ষণশীল হওয়ার কি কথা ছিল কৃষ্ণভাবিনীর শ্বশুরবাড়িরও, বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন কৃষ্ণভাহিনীর শ্বশুরমশাই হাইকোর্টের উকিল শ্রীনাথ দাস, বিধবা বিবাহ করেছিলেন তাঁর ভাসুর বিখ্যাত নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস। কিন্তু নিজের পারিবারিক পরিমণ্ডলে বিচিত্র এক স্ববিরোধ ছিল বিদ্যাসাগরের বন্ধুটির, উপেন্দ্রনাথের বিধবা বিবাহ মানতে পারেননি তিনি, মানতে পারেননি কনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথের ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত যাওয়াও, বিলেত - প্রত্যাগত পুত্রকে গৃহচ্যুত করেছিলেন তিনি। অনেকখানি অনিশ্চয়তা নিয়েই সেদিন বিলেতে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন স্বগৃহচ্যুত দেবেন্দ্রনাথ, সংকটের সামনে দাঁড়িয়েছিল কৃষ্ণভাবিনীর ভবিষ্যৎ, একদিকে কেবল স্বামী আর অনিশ্চিত জীবন, অন্যদিকে সংসার সন্তান, সুনিশ্চিত পায়ের তলার মাটি; তবু দৃঢ়তার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কৃষ্ণভাবিনী, অনুবর্তন করেছিলেন স্বগৃহহারা স্বামীরই, বেছে নিয়েছিলেন অজানা ভবিষ্যৎ। আর এসবেরই ফল, কন্যা তিলোত্তমাকে সেদিন তাঁদের রেখে যেতে হয়েছিল তার স্বগৃহে, তার পিতামহের আশ্রয়ে।

তাই স্বামীর সঙ্গে ইংলন্ডে চলে গেলেন কৃষ্ণভাবিনী বুকের মাঝে তিলোত্তমা নামে এক বালিকার মুখশ্রী বহন করে, যার পাঁচ বছরের বালিকামুখের ছায়া আজীবন সঙ্গী হয়ে রইল তাঁর, তার বাকি জীবনটার সৌভাগ্যে-দুর্ভাগ্যে এতটুকু অধিকার আর রইল না কৃষ্ণভাবিনীর! বালিকা তিলোত্তমার জীবনটাও তো আমূল বদলে দিল কৃষ্ণভাবিনীর বিদেশযাত্রার সিদ্ধান্ত, বাবা-মায়ের অনুপস্থিতিতে দশ বছর বয়স হতেই বিয়ে হয়ে গেল সে-মেয়ের, দেবেন্দ্রনাথ আর কৃষ্ণভাবিনী দেশে ফিরে আসার পরেও বিলেতফেরৎ বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগের অনুমতি পেল না বালিকাবধূটি, আজীবনবঞ্চিত তিলোত্তমার কবিতার পাতায় আঁকা হয়ে রইল অসুখী মেয়েটির চোখের জলের দাগ,

মরুভূমময়, সংসারের মাঝে
কিরূপে আছি, জান না জননী।
পিতা, মাতা, স্বামী থাকিতে বঞ্চিত,
আছে মৃত তব তনয়া দুখিনী।।

বিন্দুমাত্র চিন্তা, করিলে না মনে,
কেহ কোথা নাই, ধূ ধূ চরিদিকে।
মাতার অঞ্চল ধরিবারে যাই,
মা হয়ে গিয়াছ ফেলিয়া বিপাকে।।

এতখানি কষ্ট নিয়ে, এত বড়ো দাম দিয়ে, ভ্রমণকথা লিখবেন বলে কলমখানি হাতে তুলে নিয়েছিলেন কৃষ্ণভাবিনী, দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর অর্জনের মুহূর্তগুলোর মুখোমুখি। অর্জনের মুহূর্তও কিছু ছিল বৈকি কৃষ্ণভাবিনীর, বিলেতযাত্রায় স্বামীর সঙ্গিনী হয়েছিলেন তিনি কয়েকটি সদর্থক ভাবনা মনে নিয়ে, তার একটি এইরকম,

কত পুত্র তব বিদ্যা শিখিবারে,
যায় মা! ইংলন্ডে ছাড়ি প্রিয়জন;

অভীষ্ট জ্ঞানার্জনের শেষে ফিরেও আসে তারা, মায়ের তনয়াদেরই কি কেবল সে-অধিকার নেই? কৃষ্ণভাবিনীর বাসনায় ধরা ছিল এই জিজ্ঞাসা,

কেন মোরা তবে হয়ে তব সুতা,
পারি না জননি! সে দেশে যাইতে,
বিদ্যা জ্ঞানধনে হৃদয় ভূমিতে,
দেখিযা স্বাধীন ব্রিটন-দুহিতা।

এ-জিজ্ঞাসায় চোখ রেখে কোনো কোনো মনোযোগী পাঠকের হয়তো মনে পড়ে যেতে পারে এ-প্রশ্নের সার্থকতার ছবিটি, মনের কোনো উঁকি দিয়ে যেতে পারে দীর্ঘ বিলেতবাসের বেশিরভাগ সময়টায় ব্রিটিশ মিউজিয়ামের লাইব্রেরি আর অন্যান্য গ্রন্থাগারে অধ্যয়ননিরত কৃষ্ণভাবিনীর নিমগ্ন মুখখানি।

আরো একটি সুগভীর আকাঙ্ক্ষাও মনে ছিল কৃষ্ণভাবিনীর

বহুদিন হতে হৃদয়ে আমার,
গোপনে রয়েছে এক আশালতা,
দেখিবার তবে প্রিয় স্বাধীনতা,
যাইব যে দেশে বসতি উহার।

মনে-প্রাণে স্বাধীন দেশকে দু'চোখ ভরে দেখবার এই এক আকাঙ্ক্ষা নিয়েও তো বিদেশ পাড়ি দিয়েছিলেন

সেদিন কৃষ্ণভাবিনী, পরাধীনতার দ্বৈত যন্ত্রণায় ঘেরা তীব্র এক বোধ মর্মে মর্মে আঁকা ছিল তাঁর বুকের গভীরে, পরাধীনতার এক বোধ ভারতয় নাগরিক হিসেবে ব্রিটিশের চরণে দলিত হওয়ার, আর এক পরাধীনতার বোধ কেবল ভারতীয় হয়ে জন্মাবারই নয়, ভারতীয় নারী হয়ে জন্ম নেওয়ারও, সে-বোধ পরাশ্রিত এক নারীজন্মের, যাতে 'পিঞ্জরে'ই কেটে যায় আজীবন, দিনের পরে দিন কাটিয়ে দিতে হয় 'চক্ষুহীনা' হয়ে।

কৃষ্ণভাবিনীর ইংল্যান্ড যাত্রার এই ছবিটি তাই বড়ো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে তাঁর কলমের আঁচড়ে,

> আজ আমি মুখ খুলিয়া কলের গাড়িতে উঠিলাম।

ইংলন্ডের জাহাজে ওঠবার জন্যই 'কলের গাড়িতে' আগে বোম্বাই গেলেন কৃষ্ণভাবিনী, আর সে-গাড়িতে ওঠবার মুহূর্তে ঘর ছেড়ে এলেন বাইরে, এলেন 'মুখ খুলিয়া', বেরিয়ে এল এক ঘোমটা-খসা নারী, ভেঙে গেল 'পিঞ্জরে'র সেই চেনা আর অভ্যস্ত শিকল, বদলে গেল তাঁর ঘর আর বাহিরের চেনা বিন্যাস। মেমসাহেবি পোশাকে ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে আসা এই বিবরণে সেই প্রথম কলের গাড়ি চড়ার বর্ণনাটুকুই ধরা রইল না কেবল, এর প্রতিটি অক্ষরে জড়িয়ে রয়ে গেল কৃষ্ণভাবিনী নামে এক বঙ্গবধুর ঘোমটা খোলা মুখের ছায়া, তাঁর দ্বিধায় জড়িত পায়ের চলায় মিশে রইল প্রথম চলার বেগে পায়ের তলার রাস্তা জেগে ওঠার ছন্দ।

বোম্বাই স্টেশনে একলা দাঁড়ানো এই বঙ্গমহিলাটির দিকে এবার একবার চেয়ে দেখলে পাঠকের চোখে পড়বে, স্বদেশের মাটি তখনও ঘিরে আছে তাঁকে, আর শরীর ঘিরে আছে পাশ্চাত্ত্য পোশাক, এখনই, পাঠক কান পেতে একবার শুনে নিতে পারেন তাঁর এই মুহূর্তটির সচেতন অনুভূতিমালা,

> আমার স্বামী আমাকে সতর্ক হইয়া সব জিনিস দেখিতে বলিয়া আমাদের থাকিবার জন্য হোটেল ঠিক করিতে গেলেন। আজ যদি আমি ঘোমটা দিয়া এই স্টেশনে দাঁড়াইতাম তাহা হইলে কত লোক চাহিয়া দেখিত, কিন্তু আমাদের দেশে ইংরেজী পোষাকের কি মাহাত্ম্য! কেহ তাকাইতেও সাহস করে না, সকলেই ভয় পায়।

একটু মনোযাগী পাঠক প্রথম অধ্যায়েই জেনে গিয়েছেন কৃষ্ণভাবিনীর ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনার উদ্দেশ্য, পাঠক কী পাবেন তাঁর লেখায়, নিজেই তা নির্দেশ করতে চেয়ে প্রথম অনুচ্ছেদেই পাঠকপাঠিকাগণের উদ্দেশে জানিয়েছেন কৃষ্ণভাবিনী,

> ইহাতে কোন মনের উত্তেজক বীরনারী অথবা বীর পুরুষের আখ্যায়িকা নাই, কোন আদি বা করুণ রসাত্মক কাব্যও নাই, কেবল স্বাধীন ও পরাধীন জীবনে কত প্রভেদ তাহাই ইহাতে দেখিতে পাইবেন।

স্বাধীনতাহীনতার যন্ত্রণা এই প্রথম অধ্যায়টি থেকে একেবারে শেষের অধ্যায় পর্যন্ত কখনো ছেড়ে যায়নি কৃষ্ণভাবিনীকে, প্রথম অধ্যায়ের 'পূর্ব্ব কথা'য় লিখেছিলেন 'স্বাধীন ও পরাধীন জীবনে কত প্রভেদ', এ-লেখায় তাই শোনাবেন তিনি, বিশ অধ্যায়ে পৌঁছে 'শেষ কথা'য় লিখলেন,

> এদেশে কত নূতন দ্রব্য দেখিলাম, কত নূতন বিষয় জানিলাম, কত নূতন জ্ঞান উপার্জ্জন করিলাম, কিন্তু যতই অধিক দেখিতেছি, যতই অধিক জানিতেছি, যতই অধিকদিন এখানে রহিতেছি ততই আমাদের ভারতের কথা মনে পড়িয়া আমার হৃদয় অধিকতর দহিতেছে। এদেশে আর সে দেশ যেই মিলাইয়া দেখিতেছি ততই দুইটি দেশের মধ্যে অসীম প্রভেদ বুঝিতে পারিতেছি ও ভারতের হীনাবস্থা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়া মনঃকষ্টে পীড়িত হইতেছি।

লিখলেন,

> অনেক জাতির বল থাকে না, বুদ্ধি ও একতা থাকে না, কিন্তু দৃঢ় স্বদেশানুরাগের প্রভাবে তাহারা নিজেদের হীনাবস্থা হইতে উদ্ধারসাধান করিয়াছে। কিন্তু স্বদেশপ্রিয়তা কাহাকে বলে, আমরা তাহা জানি না। দেশের দুরবস্থা দেখিয়াও অক্ষুণ্ণভাবে দিনযাপন করি এবং স্বদেশের প্রতি অত্যাচার দেখিয়াও আমরা চঞ্চল হইয়া নিজ নিজ বিলাস পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হই না। সকলেই পশুর ন্যায় আত্মসুখে রত ভারতের হিতাহিতে একেবরে জ্ঞানশূন্য; কিসে দেশের উন্নতি হয় বা কিসে দেশের অপকার হয় তাহা আমরা কখন একাগ্রচিত্তে পর্যালোচনা করি না।

'পূর্ব্ব কথা' থেকে 'শেষ কথা'য় পৌঁছবার মাঝে এই দীর্ঘ যাত্রায় তবে এত কী 'নূতন দ্রব্য' দেখলেন, 'নূতন বিষয়' জানলেন, অর্জন করলেন 'কত নূতন জ্ঞান'? দেখেছিলেন তিনি ইংরেজদের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবন, দেখেছিলেন ইংল্যাণ্ডের শিক্ষার ব্যবস্থা, গার্হস্থ্যজীবন, উৎসব - ধর্মাচরণ, এমনকি খেয়াল করেছিলেন তাদের সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি; সেই সঙ্গে দেখেছিলেন লন্ডন শহর, উনিশ শতকের শেষভাগের লন্ডন, যাকে প্রথম দেখে কেউ বলতে পারে 'বিজ্ঞাপনের নগর' বা 'দোকানের নগর', 'নাট্যশালার নগর' অথবা 'ধনের নগর'। প্রকাণ্ড লন্ডন শহরকে কলকাতার প্রতি তুলনায় দাঁড় করিয়ে লিখেছিলেন কৃষ্ণভাবিনী,

> লন্ডন কলিকাতার প্রায় চারিগুণ জায়গা জুড়িয়া অবস্থিত, এবং বসতিতে লন্ডন কলিকাতর আটগুণ— এখানে চল্লিশ লক্ষ লোকের বাস। একটা গাড়ী করিয়া পাঁচ ছয় দিন ক্রমাগত লন্ডনের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইলে এই নগর দেখিয়া শেষ করিতে পারা যায়, কিন্তু রাস্তা চেনা ভার। লন্ডন এত বড় তবু এখনও বাড়িতেছে, যে দিকে যাও দেখিবে, শত শত নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে আর পার্শ্বস্থ পল্লীগুলি ইহার সহিত এক হইয়া যাইতেছে।...
>
> ...বোধ হয় কলিকাতার সর্ব্বশুদ্ধ যতগুলি বাড়ী আছে, এখানে কেবল দোকানের সংখ্যা তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশি। রাত্রিতে দোকানের শোভা দেখিতে বড় চমৎকার, এখানে অতি সুন্দর ও সুচারুরূপে দোকান সাজায়, আর গ্যাসের আলোতে দোকানের জিনিসগুলো ঝক্ ঝক্ করিয়া এত লোভ দেখায় যে, বোধ হয় দরিদ্র লোকেরা দেখিয়া অনেক কষ্টে লোভ সংবরণ পূর্ব্বক মনের দুঃখে বাড়ী ফিরিয়া যায়।

তবে কি লন্ডনের বৈভব চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল কৃষ্ণভাবিনীর? একটু মনোযোগ দিলেই কিন্তু কৃষ্ণভাবিনীর

পাঠক দেখেন, দীর্ঘ বিদেশবাসের দিনগুলিতে লন্ডনের ঐশ্বর্যময় মুখখানিই কেবল চোখে পড়েনি বিদেশিনী এই বঙ্গমহিলাটির, চোখ পড়েছে তাঁর শ্রমজীবী মানুষের পাড়া লন্ডনের পূর্বভাগেও; ওইসব মানুষগুলোর সামাজিক আর আর্থিক অবস্থানের অপার দারিদ্র্য তাঁর অনুভবে ধরা দিয়েছে যেমনি, তেমনই ধরা দিয়েছে তদের স্বভাবের দৈন্য; কৃষ্ণভাবিনীর বিচারে,

> এদেশের দারিদ্রদের গরিবমানুষের বদলে 'ছোটলোক' বলিতে হয় কারণ আমাদের দেশের ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের গরিবলোকেরা নম্রও লোকের মান রাখিয়া চলে; কিন্তু ইংলন্ডের, বিশেষ লন্ডনের দরিদ্রলোকেরা একেবারে পশুর মত। কেহ এই ভাগে গেলে মনে করিবে না যে লন্ডনে একটীও ভদ্রলোক আছে বা ইংলন্ড একটী সভ্যদেশ।

স্বাধীনতা দেখতে বিদেশ পাড়ি দিয়েছিলেন কৃষ্ণভাবিনী, বুকে নিয়ে গিয়েছিলেন দ্বৈত অধীনতার দ্বিগুণ ভার, ও-দেশের স্বাধীন মেয়েদের নিঃসঙ্কোচ যাপনদিন দেখতে দেখতে ফেলে আসা স্বদেশের আলোহীন মেয়েদের বিধুর মুখগুলিও কি একবারও মনে পড়ে যায়নি তাঁর? কৃষ্ণভাহিনীর কলমে স্বনির্ভর ইংরেজ মহিলার যে-ছবি ফুটে ওঠে তাতে দেখি,

> ইংরেজ মহিলারা বিনয়বতী ও আতিথেয়ী নয়। কোন ব্যক্তির সহিত কথা কহিবার সময় ইহারা শিষ্টাচার পূর্ব্বক আলাপ করিতে জানে না এবং কোন অভ্যাগত ব্যক্তি বাড়ীতে আসিলে ভারতমাহিলাদের মত ইহারা নিজের আহার ত্যাগ বা অগ্রাহ্য করিয়া অভ্যাগত ব্যক্তিকে ভোজন করাইতে অগ্রসর হয় না।

ইংরেজ মহিলাদের সম্পর্কে কোন কোন বিষয়ে এমন অননুকূল বিচার করলেও, ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা-র পাতার পরে পাতা জুড়ে দেখি, সে-মেয়েদের স্বভাবের বহু সদ্‌গুণ বিষয়েও সচেতন ছিলেন কৃষ্ণভাবিনী, সচেতন ছিলেন তাঁদের সংসার পরিচালনক্ষমতা, দাম্পত্যে তাঁদের সহমর্মিতা, তাঁদের স্বাধীন সত্তা, বিশেষ তাঁদের শিক্ষিত চারিত্র বিষয়ে, এমনকি, বিদেশিনীদের সতীত্বের বিচারও তিনি করেছিলেন এই মানদণ্ডে,

> এ দেশে যাহারা সতী আমার মতে তাহারাই প্রকৃত সতী; কারণ একেবারে পুরুষের মুখ না দেখিয়া বা পুরুষের সহিত না মিশিয়া অনেকে সতীত্বের গৌরব করিতে পারেন বটে; কিন্তু যাহারা পুরুষের মধ্যে থাকিয়া, পুরুষের সঙ্গে সমভাবে বেড়াইয়া ও আলাপ করিয়া নিজেদের অমূল্য ধর্ম্মরত্নকে না হারান, তাঁহারাই যথার্থ প্রশংসা পাইবার যোগ্য এবং তাঁহাদেরই মনের ও ধর্ম্মের তেজ অধিক।

প্রতীচ্যের মেয়েদের ঘিরে কৃষ্ণভাবিনীর এই মূল্যায়নে তাদের প্রশস্তি আছে নিশ্চয়ই, তবে তারই পাশাপাশি ফল্গুধারার মতো বয়ে চলেছে নাকি প্রাচ্যের মেয়েদেরও অবরোধ মুক্তির আহ্বান?

ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা নামে বইখানির পাতা উল্টোলে আজকের যে-কোনো পাঠকেরই হয়তো চোখে পড়বে, বিলেতফেরৎ মেয়ের প্রথম কলমের আঁচড়ে অনেক পর্যবেক্ষণ ছড়িয়ে আছে কৃষ্ণভাবিনীর বইয়ের পাতায় পাতায়, ছড়িয়ে আছে পর্যবেক্ষণের অনেক ব্যাপ্তি আর গভীরতা, কিন্তু পাতা উল্টে যেতে যেতেও মনে হবেই সে-পাঠকের, এমনি করে প্রতীচ্যের মেয়েদের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে কীভাবে তাঁর বারেবারেই মনে পড়ে গেছে ঘরের মেয়েদের ম্লান মূক মুখগুলি, এসব সুযোগই কখনো যাদের দেয় না সমাজ। দাম্পত্য-সম্পর্কে প্রতিতুলনা তো বিদেশবাসের প্রতি পদেই মনে এসেছে কৃষ্ণভাবিনীর, পাশ্চাত্ত্য দম্পত্তির দিনযাপন দেখে নিজের দেশের কথা মনে করে কৃষ্ণভাবিনী লিখেছেন,

> অবরুদ্ধ স্ত্রী, স্বামী কি প্রকারে সমস্ত দিন কাটান, তাহা জানেন না, এবং স্ত্রী কিরূপে কালযাপন করেন তাহাও স্বামী জানেন না। বাবুদের নামে বাড়ীর গৃহিণীরা ভয় পান। বাবুরা সুন্দর সাজান বৈটকখানায় বসিয়া হুঁকা টানেন, তাস পেটেন কিম্বা ইয়ারবর্গের সহিত গল্প আমোদ করেন ও বেড়াইতে যান; কিন্তু গৃহিণীরা সেই বাড়ীর ভিতর বসিয়া এক সংসার লইয়াই ব্যস্ত। স্ত্রী স্বামীকে ভাল বাসেন, তিনি কি প্রকারে ভাল খাইবেন ও সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবেন তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন; কিন্তু স্বামী তাঁহার প্রতি যথার্থ ব্যবহার করেন না এবং তিনিও পতির প্রতি যথার্থ ব্যবহার করিতে পান না বা জানেন না। স্ত্রীপুরুষে যথার্থ কি সম্বন্ধ তাহা আমাদের দেশের অতি অল্প লোকই বুঝেন।

আর এই চেনা দাম্পত্যপ্রবণতার ওপর দাঁড়িয়ে পাশ্চাত্ত্য বিবাহবিধির পারস্পরিকতা খেয়াল করেছেন কৃষ্ণভাবিনী, অনুভব করেছেন, ইংরেজ নারী-পুরুষ পরস্পরের সহমর্মী বটে, কিন্তু বিচ্ছেদের মুহূর্তে, ছেদের দাবি একতরফা নয় তাদের। আমাদের দেশ যেমন কেবল স্ত্রীত্যাগের বিধানেই উৎসাহী, উদাসীন স্বামীত্যাগের প্রশ্নে, একেবারেই তেমনটা নয় ইংল্যান্ডে,

> স্বামী যে কেবল নিজেরই ইচ্ছামত কাজ করিবেন তাহা এদেশে কখন খাটে না।

আজকের পাঠক আমরা তো জানিই, ১৮৮৫ সালে ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা নামে তাঁর বইখানিও স্বনামে প্রকাশ করেননি কৃষ্ণভাবিনী, 'বঙ্গমহিলা-প্রণীত' এই তথ্যটুকুমাত্র আখ্যাপত্রে ধারণ করেই প্রকাশিত হয়েছিল বই; আমরা জানি, পণ্ডিত রমাবাঈ সরস্বতী বা আনন্দীবাঈ জোশীর মতো ভিন্নতর চরিতার্থতা অর্জনের জন্য বিদেশযাত্রা কনেরনি কৃষ্ণভাবিনী দাস, আরো পড়াশুনা করবেন বলেই যাননি ভিন্ন দেশে, অনেকটা অনন্যোপায় হয়েই ঘর ছেড়েছিলেন তিনি, অনেক কিছু হারিয়েই অবলম্বন করেছিলেন পথকে, জীবনের সই অনেক হারিয়ে পাওয়া গতিকে তিনি বদলে নিতে চেয়েছিলেন স্বাধীনতার মন্ত্রে; ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা-র পাতায় পাতায় জেগে উঠেছিলেন এক ঔপনিবেশিক শাসকের দেশ, স্বাধীনতার খোলা হাওয়ার দেশ, উপনিবেশের এক শাসিত মেয়ে ভিন্ন এক সংস্কৃতির দেখার চোখ নিয়ে তাঁর লেখার পরতে পরতে জাগিয়ে তুলেছিলেন নিজস্ব দৃষ্টির অভিজ্ঞান।

বাঙালি মেয়ের কলমে দূরভ্রমণের এমন সব ছবি ধরা দিয়েছে আরো অনেকবার, অনেকেরই মনে পড়বে

পশ্চিমযাত্রিকী নামে পরিচিত বইটির কথা, বইটির লেখিকা দুর্গাবতী ঘোষ ছিলেন বিখ্যাত বাঙালি মনোবিদ্ গিরীন্দ্রশেখর বসুর কন্যা, বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের স্ত্রী দুর্গাবতী ইউরোপের নানা দেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন স্বামীর সঙ্গে, তবে উনিশ শতকে নয়, বিশ শতকেরও অনেকগুলো দিন পেরিয়েই বিদেশ পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি, ১৯৩২ সালে, তাঁর বইটিও প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৩৬ সালে। বছর-পঁচিশ পরে অবশ্য আরো একবার বিলেতে গিয়েছিলেন তিনি, তবে দ্বিতীয়বার নয়, তাঁর সেই প্রথমবারের যাত্রাকাহিনীটিই কেবল ধরা আছে পশ্চিমযাত্রিকী-তে। দুর্গাবতী ঘোষের জন্ম বিশ শতকের প্রথম দশকে, তাঁর পশ্চিমযাত্রিকী-র পাতায় এখনও স্থির হয়ে আছে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার ঘটেছিল তাঁদের, অবশ্য বিশ্ববরেণ্য ফ্রয়েড দুর্গাবতীর কৌতূহলী মেয়েলি চোখে ধরা দিয়েছিলেন নিতান্তই এক 'থপথপে বৃদ্ধ ভদ্রলোক' হিসেবে, 'একেবারে নিতান্ত সাদাসিধা মানুষ', যাঁর 'হাতে একটি জ্বলন্ত সিগার ও সমস্ত দাঁতগুলি সোনা দিয়ে বাঁধান।'

দুর্গাবতীর ভ্রমণকাহিনীটিতে একবার উঁকি দিলে তাঁর কলমের উপভোগ্যতার স্বাদটুকু হয়তো আজও তৃপ্ত করবে পাঠককে, মেয়েলি বাগ্‌ভঙ্গিমায় কৌতুকের লঘু সুর বেজে উঠবে পিরামিডের দেশে এসে তাঁর ছবি তোলবার কৌতুককর বিবরণীটিতে, দুর্গাবতীর কলমের আঁচড়ে, ফুটে -ওঠা যে-বিবরণটি, মন্তব্য - সহ এইরকম,

> ফটো তুলতে গিয়ে সে এক হসির ব্যাপার, আমরাও চড়ব না, আর গাইডও ছাড়বে না, বলে কি, ছবি তোলবার সময় অন্তত একবার উটের পিঠে চড়তেই হবে। তাকে বোঝান গেল আমরা মাটিতে দাঁড়িয়ে ছবি তোলাতেই ভালবাসি। সে নাছোড়বান্দা, বললে, উটের পিঠে যদি নিতান্তই না ওঠ তো, উটের লাগামটি হাতে ধ'রে তোমাদের 'হাসব্যান্ড'দের ঠিক পাশেই দাঁড়াও, তা হ'লে কায়দা মন্ত হবে না— কি করি, পড়েছি যবনের হাতে, একবার ধরতে চেষ্টা করলুম, পোড়া উট এমন বিকট সুরে ডেকে উঠল যে লাগাম ছেড়ে ব'লে ফেললুম, না বাপু, কাজ নেই এসব কায়দায়। বাঙ্গালীর মেয়ে, সকাল হ'লেই ভাঁড়ার বের ক'রে বঁটি পেতে কুটনোয় বসা অভ্যেস, এ হেন মনিষ্যি চোখে পিরামিড দেখছি তাই চথেষ্ট। স্বামীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখব এখন, তাঁর উটের লাগাম না ধরলেও চলবে।

দুর্গাবতীর দ্বিতীয়বার বিলাতভ্রমণের অভিজ্ঞতা আর ভ্রমণকথা নয়, ধরা দিয়েছিল একটি দীর্ঘ কবিতার আকারে। বিশ শতকের মাঝামাঝি পৌঁছে, ১৯৫৭ সালে লেখা 'অপ্রকাশিত' কবিতাটি এখন স্থান পেয়েছে দে'জ পাবলিশিং ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব উইমেনস্ স্টাডিজ প্রকাশিত অভিজিৎ সেন আর অনিন্দিতা ভাদুড়ী সম্পাদিত পশ্চিমযাত্রিকী-তে, অমিতরঞ্জন বসুর ভূমিকায়। কবিতা জুড়ে ছড়িয়ে আছে 'সিকি শতাব্দী' পরে দেখা দেশটার নানা ছবি, সমালোচনার আঁচড় ধরা দিয়েছে 'বিলাত দেশের বাহিরে জলুষ' ঘিরে। ইংরেজের পরিচ্ছন্নতাবোধ ঘিরে অসমর্থনের সুরে লিখেছেন দুর্গাবতী,

দরকার হলে টিকিট আঁটিতে
বই পাতা উলটাতে
এ দেশের লোক হাতের আঙ্গুল
মুখে দেয় থুতু নিতে।
থুথুতে মুছাবে ছেলের দুগাল
থুথু বড় দরকারি
এদেশের লোক রাঁধে বোধ হয়
থুথু দিয়ে তরকারি।।

তাঁর অনভ্যস্ত মনে বিরূপতা ছুঁয়ে গেছে ইংরেজের প্রকাশ্যে রৌদ্রসেবনের অভ্যাসে, তাদের খাদ্যাভাসে, দুর্গাবতী লিখেছেন,

রৌদ্র দেখিলে ছেলে ও বুড়োয়
শুইয়া কাটায় মাঠে
সারা গা নেংটা মেয়ে ও পুরুষ
শিশুদলে রোদ চাটে।।
নয় মাস ধরি পায় না দেখিতে
সূর্যরশ্মি আলো
এ দেশের লোক রৌদ্র সেবিতে
তাই এত বাসে ভালো।।

কিংবা

ষাঁড়ের জিহ্বা, গরুর মাংস
শুয়ারের নাড়ি ভুড়ি
গর গর করি খায় ইংরাজ
নাহি রে তাহার জুড়ি।।

দুর্গাবতীর অপছন্দ ধরা দিয়েছে তাঁর কবিতাশেষের উপমায়, তাঁর চূড়ান্ত সমালোচনাও।

এই রোদ উঠে, এই হাওয়া চলে
এই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি
হবুচন্দ্র রাজার এদেশে
বিধাতার অনাসৃষ্টি।।

বিলেতকে দুর্গাবতীর এই দেখা যদিও বিশে শতকের অনেকগুলো দিন পেরিয়ে এসেই, কৃষ্ণভাবিনীদের প্রথম যুগের দেখার সঙ্গে এ-দেখার পার্থক্য হওয়াই স্বাভাবিক। বিলেতে পা রেখে অধীনতাপাশমুক্ত কৃষ্ণভাবিনী একটা স্বাধীন দেশের জলহাওয়া গায়ে মাখতে চেয়েছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা তখনও ছিল দূরাগত এক স্বপ্ন, তাঁর দেখার চেয়ে অনেকখানি আলাদা তো হয়ে যাবেই এক স্বাধীন দেশের নাগরিকের দৃষ্টিভঙ্গি, দুর্গাবতীর দ্বিতীয়বারের বিলাতভ্রমণের সময়ে ভারতের স্বাধীনতা আর স্বপ্ন নয়, তার বাস্তব পেরিয়ে গেছে একটা দশক; দুর্গাবতীর কলমে আঁকা এ-কবিতায় বিলেতের এই সমালোচনায় হয়তো কৃষ্ণভাবিনী থেকে দুর্গাবতী— একটা যাত্রা সম্পূর্ণ হলো মেয়েদের বিলাতভ্রমণকথার।

।। তিন।।

উনিশ শতকের মেয়েদের কলমে ধরে-রাখা ভ্রমণকথার পথরেখা ধরেই আজকের পাঠকের এ-কলমের চলার শুরু, তবু বিশ শতকের প্রথম দু'এক দশকে এমন দু'য়েকটি ভ্রমণকথার পাতাতেও চোখ পড়ে যায়, যাদের কলমের সুর যেন মিলে যায় উনিশ শতকের ভ্রামণিকদের সঙ্গেই। তখন মনে হতে থাকে, উনিশ আর বিশ শতকের মূল ফারাকটা তো এইখানেই যে, ক্যালেন্ডারের পাতায় যতই এগোচ্ছে সময়, অবরোধের বাঁধন ততই খসে পড়তে শুরু করেছে মেয়েদের চার পাশ থেকে, অনধীন জীবনে একটু একটু করে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে মেয়েরা, বহিরঙ্গে অন্তত অনেকখানিই উদার হয়েছে রক্ষণশীল সমাজের অনড় মনোভঙ্গি, পথে চলার সেই সাবলীলতা আর স্বাচ্ছন্দ্যও ফুটে উঠতে শুরু করেছে অনন্যসহায় মেয়েদের ভ্রমণকথার সুরে সুরে। বিশ থেকে অনায়াসে একুশ শতকে পৌঁছে যাওয়া নবনীতা দেবসেন, কিংবা, সুদীপ্তা সেনগুপ্তের আন্টার্টিকা অভিযানের বয়ানের দিকে যখন আজ অবাধে এগিয়ে চলেছে মেয়েদের ভ্রমণকথার সমৃদ্ধ ভাণ্ডার, তখন, উনিশ আর বিশ এ-দুই শতকের মাঝে সীমারেখা টানতে চাইলে হয়তো পড়ে নিতে হয় কাল্পনিক এক পরিসর, ভেবে নিতে হয়, উনিশ শতকের সীমানায় যাদের জন্ম, সেইসব যাত্রিক বাঙালি মেয়ের কলমের বয়ানই প্রাধান্য পাবে এ-লেখার কালভাবনায়, এমনিভাবে মেয়েদের ভ্রমণকথার জগতে একটা খড়ির গণ্ডিই এঁকে দেওয়া যায় হয়তো।

আর সেই সূত্র ধরেই এ-লেখায় এসে পড়তে পারে এমন এক ভ্রমণকথার বিবরণী, যার লেখিকা গিয়েছিলেন জাপান ভ্রমণে, নিছক ভ্রমনেই গিয়েছিলেন, এমনটা বলা যায় না অবশ্য, জাপান নামের সে-দেশটাই যে ছিল তাঁর শ্বশুরবাড়ি। বিশ শতক দু'দশকের পুরানো হওয়ার আগেই সেকালিনী ওই বাঙালি মেয়ে জাপানী এক যুবককে বিয়ে করে পাড়ি দিয়েছিলেন জাপান, শ্বশুরবাড়ি যাবেন বলে, আর সেই বিবরণই শোনাতে বসেছিলেন তিনি স্বকালীন বাঙালি পাঠককে।

তথ্য হিসেবে এটা ঠিক যে, শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার বিবরণখানি স্বকালের বাঙালি পাঠককে তিনি শোনাতে চেয়েছিলেন বলেই বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা নামে বাংলা ভাষায় জাপান ভ্রমণবিয়ক প্রথম বইটি লেখা হয়ে উঠেছিল এই বাঙালি মেয়েরই কলমে; কিন্তু, এই কথাটাও তো ভুল নয় যে, জাপান ভ্রমণ ঘিরে যে বাংলা বইটির নাম প্রথমেই মনে পড়ে যায় যে-কোনো বাঙালি পাঠকের, অবধারিতভাবে সে-বইয়ের নাম জাপানযাত্রী, লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যে-বই সম্পর্কে কোনো কোনো পাঠক এ-ও বলে দিতে পারেন যে, সেই প্রকাশ পেয়েছিল ১৩২৬ বঙ্গাব্দে, ইংরেজি ১৯১৯ সালে; আর তখন তো তথ্যের খাতিরে সে -পাঠকটিকে আজ জানিয়ে দিতেই হয় যে, রবীন্দ্রনাথের বইটিরও চারবছর আগে, ১৯১৫ সালেই প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল এ-মেয়ের লেখা বইটি।

তবু, এত কথার পরেও, মেয়েটিকে চেনা কি এখনও খুব সহজ? এমনকি, যদি বলি তার স্বামীর নাম উয়েমন্ তাকেদা, ঢাকা শহরের বাঙালি মেয়েটি জাপানি ওই যুবককে বিয়ে করেছে ১৯০৬ সালে আর জাপানে শ্বশুরবাড়ি গেছে ১৯১২ সালে, তাতেও তাকে আজ চেনবার কোনো সুবিধে হবে কি আমাদের? এইসব তথ্যসূত্রের ওপর ভর করে খুব বেশি পাঠক বোধহয় আজও চিনে নিতে পারবেন না সেকালিনী এই বাঙালি মেয়ের হরিপ্রভা তাকেদাকে।

আজকের পাঠক আমাদের জানার যে কোনো উপায় নেই, কেমনভাবে ঢাকা উদ্ধার আশ্রমের সেবিকা নগেন্দ্রবালা মল্লিকের মেয়ে হরিপ্রভা-র সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ভাগ্যান্বেষী জাপানি প্রযুক্তিবিদ উয়েমন্ তাকেদার-র, কেমন করেই বা সে পরিচয় পৌঁছেছিল ব্রাহ্মসমাজ-নির্ধারিত 'নবসংহিতা রীতি'-র পরিণয়ে, আর হরিপ্রভা মল্লিক হয়ে উঠেছিলেন হরিপ্রভা তাকেদা! আধুনিক বাঙালি পাঠকের হাতে বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রার যে প্রথম পাঠটি ধরা দেয় একালে, বিশ শতকের প্রান্তসীমা ছুঁয়ে, ১৯৯৯ সালে ঢাকার সাহিত্য প্রকাশ থেকে প্রকাশিত মনজুরুল হক সংগৃহীত সে-বইটি থেকে অন্তত হরিপ্রভার জীবনের এর চেয়ে খুব বেশি কিছু তথ্য মেলে না, হরিপ্রভার মায়ের পরিচয় জানা গেলেও জানা যায় না আর তেমন কোনো পারিবারিক পরিচয়, বিশেষত, তাঁর পিতার পরিচয়; চারমাসের জাপানবাসের শেষে ভারতে ফেরার পর দম্পতির বাকি জীবনকথারও কোনো হদিশ মেলে না ওই বইয়ের ভূমিকায় সংগৃহীত তথ্য থেকে।

তবে, এক দশক পেরিয়ে, ২০০৯ সালে কলকাতার ডি. এম. লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত মঞ্জুশ্রী সিংহ

সম্পাদিত ও সংকলিত বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা ও অন্যান্য রচনা বইটি হাতে পেলে বোঝা যায়, প্রথম জাপানযাত্রিণী লেখিকাটিকে ঘিরে উত্তরকালের কৌতূহল আর অন্বেষণ থেমে থাকেনি ওইখানেই। মঞ্জুশ্রী সিংহ সম্পাদিত এই বইটিতে ধরা আছে হরিপ্রভার বিস্তৃত পারিবারিক পরিচয়, কৌতূহলী পাঠককে যা জানায়, শশিভূষণ মল্লিক ও নগেন্দ্রবালার প্রথমা কন্যা হরিপ্রভার জন্ম ১৮৯০ সালে; জানায়, ঢাকা উদ্ধার আশ্রমের সেবিকামাত্রই ছিলেন না নগেন্দ্রবালা, নিরাশ্রয় মহিলা শিশু ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের জন্য একেবারে একক প্রচেষ্টায় 'উদ্ধারাশ্রম' নামে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন শশিভূষণ মল্লিক, পরে যা নামকরণ হয় 'মাতৃনিকেতন', সে-কাজেই তাঁর সহকর্মিণী ছিলেন তাঁর স্ত্রী। শশিভূষণ নিজেকে আশ্রমের 'সেবক' এবং তাঁর স্ত্রী ও কন্যারা নিজেদের 'সেবিকা' নামেই পরিচয় দিতেন। নতুন তথ্যের সংযোজনেও অবশ্য নিশ্চিতভাবে জানা যায় না হরিপ্রভার সঙ্গে ঢাকার বুলবুল ফ্যাক্টরি, বা, পরে নিজের গড়া ইন্দো-জাপানিজ সোপ ফ্যাক্টরি-র সাবান তৈরি কারখানার প্রযুক্তিবিদ উয়েমন্ তাকেদা-র পরিচয়ের সূত্রটি, তবে, হরিপ্রভার বাকি জীবনের অনেক তথ্যই মেলে পরবর্তীকালের এই বইটি থেকে। বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা হরিপ্রভার প্রথমবারের জাপানভ্রমণকথা, নতুন তথ্য জানায়, দ্বিতীয়বার জাপান গিয়েছিলেন তাঁরা ১৯২৪ সালে, তৃতীয়বার ১৯৪১-এ। হরিপ্রভার তৃতীয়বারের এ-যাত্রাটি বিশিষ্ট কারণ এইবারে জাপানে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল রাসবিহারী বসু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর, নেতাজীর অনুরোধে টোকিও থেকে নিয়মিত আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষে রেডিও মারফৎ প্রচারকার্য পরিচালনাও করতেন হরিপ্রভা। হরিপ্রভার কলমে আঁকা এই সময়ের কোনো বিবরণীর সন্ধান অবশ্য মেলেনি।

বাঙালি পাঠকের হাতে হরিপ্রভার কলমের আঁচড় যেটুকু ধরা আছে, অনতিদীর্ঘ সেই ভ্রমণকাহিনীটিতে ১৯১২ সালে তাঁর সেই প্রথম চার মাসের জাপানবাসের ইতিকথাটুকুই কেবল শুনিয়েছেন হরিপ্রভা, পূর্বাপর জীবনের কোনো তথ্যই আর জানাননি উৎসুক পাঠককে। তাই বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা পড়তে পড়তে যে বাঙালি মেয়েটির মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে পাঠকের চোখে, সে মুখ এক লাজনম্র বধূর, বধূটি হয়তো জাপানি পরিবারের, কিন্তু সেকালের যে-কোনো বাঙালি মেয়ের মতোই বড়ো সাধ তার শ্বশুরবাড়িতে আদৃতা হওয়ার, বড়ো আকাঙ্ক্ষা, শ্বশুর-শাশুড়ি-দেবর-ননদ-এইসব আশৈশব পরিচিত অভিধার আড়ালে এক অচেনা দেশের অপরিচিত সমাজের মানুষদের চিনে নেওয়ার।

হরিপ্রভার জাপান-বিবরণীর ভূমিকা শুরু হয় তাই পাঠককে এমন এক সলজ্জ বাসনার কথা শুনিয়ে,

> আমার যখন বিবাহ হয় তখন কেহ মনে করে নাই যে আমি জাপান যাইব। কাহারও ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু আমার বড়ই ইচ্ছা হইত আমি একবার যাই। সে ইচ্ছা স্বপ্নেই পর্য্যবসিত হইত। বিবাহের পরে শ্বশুর - শাশুড়ির আশীর্বাদ লাভ করিতে ইচ্ছা হইত।

আর, এর পাশাপাশি যদি দেখে নিই আমাদের চেনা জাপানযাত্রায় ছবিটির সেই রাজকীয় সূচনা,

> জাহাজ যখন একেবারে বন্দরে এসে পৌঁছল তখন মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য উঠেছে। বড়ো বড়ো জাপানি অপ্সরা-নৌকা আকাশে পাল উড়িয়ে দিয়ে, যেখানে বরুণদেবের সভাপ্রাঙ্গণে সূর্যদেবের নিমন্ত্রণ হয়েছে সেইখানে নৃত্য করছে।...ভাবলুম, এইবার ডেকের উপরে রাজার হালে বসে সমুদ্রের তীরে জাপানের প্রথম প্রবেশটা ভালো করে দেখে নিই।

তবে হয়তো শুরুতেই কিছুটা বুঝে নেওয়া যাবে হরিপ্রভার দেখবার চোখটিকে। প্রায় একই সময়ে জাপান দেশটাকে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ আর হরিপ্রভা, দুজনেই; বাঙালি পাঠক সচরাচর রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়েই চিনে নেন বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের জাপান নামে দেশটাকে, স্বভাবতই, কম নয় সেই চেনার সঙ্গে হরিপ্রভার চোখ গিয়ে দেখে নেওয়ার প্রভেদ। যে মন, যে মনন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন জাপানের সভ্যতার জঙ্গমতাকে, বুঝতে চেয়েছিলেন তাদের শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্যকলার পরিধিকে, মননের সে-গভীরতা অবশ্যই ধরা দেয়নি হরিপ্রভার কলমে, তাঁর মতো অন্দরবাসিনী এক তরুণী গৃহবধূর খাতার পাতায় তার আশাও কি আজ করবেন কোনো পাঠক?

কিন্তু তবে কেন আজকের পাঠক আগ্রহ বোধ করবেন হরিপ্রভা তাকেদার জাপানভ্রমণকথা হাতে তুলে নিতে? যে ভাষায় জাপানযাত্রীর মতো বই লেখা হয়েছে, সে-ভাষার পাঠক কেন পড়বেন বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা? তবু, হয়তো এ-বইখানি পড়বেন পাঠক, আজও, পড়বেন জাপানের অন্তরঙ্গ মুখখানি দেখে নেওয়ার জন্য, হরিপ্রভা আর তার শাশুড়ির চোখের জলটুকু উঁকি দিয়ে দেখে নেওয়ার জন্য, আধুনিক জাপানের ভুলে-যাওয়া কাটের খড়ম বুগুরি পায়ে পথে চলার বিস্ময় আর কৌতুকের হাসিটুকু দেখে নেওয়ার জন্য।

হরিপ্রভার জাপানভ্রমণকথার পাতা উল্টেতে শুরু করেই দেখি, কেমন করে 'ইন্দোজিন' দেখতে লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠা স্টেশন ছাপিয়ে মানুষে-টানা 'রিক্সা' করে শেষ পর্যন্ত হরিপ্রভা এসে পৌঁছেছিলেন তাঁর শ্বশুরবাড়িতে আর প্রথম আলাপেই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন জাপানিদের স্বভাবজ বিনয় নম্রতা আর অভিবাদন পদ্ধতি দেখে; প্রথম দিনে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে গুরুজনদের প্রণামের শেষে মাথা তুলেই দেখেছিলেন বিস্মিত হরিপ্রভা,

> দেশীয় প্রণালী অনুসারে উঁহারাও মাথা মাটিতে ঠেকাইয়া আছেন।

ভিনদেশী ভিন্নভাষী এক পুরুষকে পতিত্বে বরণ, তাঁর সঙ্গে সাগরপাড়ি দিয়ে শ্বশুরবাড়ির দেশে যাত্রা—কত

আশ্চর্য ঘটনাই ঘটেছে হরিপ্রভার মতো এক সাবেককালে বাঙালি মেয়ের জীবনে, আরো আশ্চর্য যে, সেই অচেনা বিদেশের একটি সানুপঙ্খ সমাজছবি স্বদেশী পাঠকের সামনে মেলে ধরার এমন আগ্রহ হয়েছিল তাঁর, আর সেই আগ্রহে নিজের হাতেই তুলে নিয়েছিলেন কলম, সেই বিশ শতকের শুরুর দশকেই। একান্ত নারীর চোখে দেখা তাঁর জাপান-ভ্রমণের ছবিগুলি, যে-কোনো বিদেশী পর্যটকের মতোই চোখে-দেখা জাপানি বাড়ি-ঘর, ঘরের সাজসজ্জা, খাওয়াদাওয়ার রীতি, সামাজিক আচার-আচরণ, পুরুষ-নারীর পোশাক-সেসবেরই অনায়াস বিবরণ ধরা দিয়েছে হরিপ্রভার বর্ণনায়, সেই সঙ্গে হরিপ্রভার মেয়েলি চোখের সকৌতুক দৃষ্টি দেখে নিয়েছে জাপনি মেয়েদের 'চুল বাঁধার ফ্যাশান', দেখে নিয়েছে বহু ক্লেশে বহু যত্নে বাঁধা চুল সুবিন্যস্ত রাখতে কতরকম কষ্টস্বীকারে প্রস্তুত জাপানি মেয়েরা,

> চুল ঠিক রাখার জন্য ইহারা বালিশে মাথা না রাখিয়া একটি অনুচ্চ কাষ্ঠখণ্ডের উপর ঘাড়টা রাখিয়া শয়ন করে। কাষ্ঠখানির উপরের দিকটা অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় কাটা বা পুতুলের বালিশের ন্যায় একটা ছোট বালিশ বাঁধা। ঐ খাঁজটায় বা বালিশটিতে ঘাড় থাকে, মাথা শূন্যে থাকে।

জাপানি অন্দরের এমন মেয়েলি ছবি দু'চোখ ভরে দেখেছেন আর তাঁর পাঠককে দেখিয়েছেন হরিপ্রভা, তাকেদা পরিবারের বধূটি শাশুড়ি-ননদ-জায়ের পাশে বসে দেখে নিয়েছেন মটরডাল দিয়ে কীভাবে তৈরি হয় 'তোফু' নামে উপাদেয় খাদ্য, কেমন করে বানানো হয় জাপানি পোলাও 'গোমোকু', বাঙালি পাঠককে শিখিয়েও দিয়েছেন সে -রন্ধনকৌশল।

বাংলাদেশের আলোহারা মেয়েদের মুখ মনে নিয়ে বিদেশে পা রেখেছিল হরিপ্রভা, অনেকখানি আগ্রহ নিয়ে দেখেছিলেন জাপানি মেয়েদের যাপনদিন, খেয়াল করেছিলেন অবরোধ নেই জাপানে, পুরুষের পাশে নিঃসঙ্কোচ তাদের চলাফেরার অবাধ পরিসর, খেয়াল করতে ভোলেননি শরীর বিষয়ে জাপানি নারী-পুরুষের জড়তাহীনতা, এমনকি 'সরকারি স্নানাগারে সকেলে একত্রে বিবস্ত্র' হয়ে স্নান করতেও লজ্জা বোধ নেই তাদের, এ দৃশ্যও নজর এড়ায়নি হরিপ্রভার।

হরিপ্রভার কৌতূহল ছিল বিবাহপ্রথার জাপানি প্রতিরূপটি ঘিরে, অল্পদিনেই জেনেছিলেন, 'বিবাহটা এরা শারীরিক সম্বন্ধ' বলেই মনে করে বলে বিয়েতে 'বাহিরের আমোদ ব্যতীত আত্মিক কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন বোধ' করে না। হরিপ্রভা খুঁজতে চেয়েছিলেন, 'শারীরিক সম্বন্ধ নির্ভর এ-সম্পর্কটিতে জাপানি বধূর সামাজিক অবস্থান কতখানি মর্যাদা আর নিরাপত্তার বোধ দেয় তাকে, খুব সদর্থক উত্তর বোধহয় মেলেনি হরিপ্রভার, জেনেছিলেন তিনি,

> মেয়েদের পতি, পতির আত্মীয়স্বজন ও শ্বশুর -শাশুড়ির সেবা পরম ধর্ম। ইহার কোনরূপ অন্যথা হইলে স্ত্রী অত্যন্ত লাঞ্ছিত হ'ন। এমনকি, শাশুড়ির অপছন্দ হইলে স্বামী অনায়াসে স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে পারেন।

যদিও হরিপ্রভা জেনেছিলেন, 'স্ত্রী -পরিত্যাগ ও পুনর্বিবাহ প্রথার' প্রচল থাকলেও সচরাচর 'একাধিক বিবাহ করে না' জাপানি পুরুষ, তবু দেশ ছেড়ে এত দূরে এসেও হরিপ্রভার সমাজবীক্ষণ তাঁকে জানিয়ে গেল প্রাচ্যের এই দেশটিতেও কী অনিশ্চয়তায় কী অবমাননায় মেয়েদের সুখের শয়ন পাতা।

তবে নিজের জীবনে শ্বশুরবাড়ি ঘিরে আনন্দময় এক অভিজ্ঞতার স্বাদ নিয়ে ফিরেছিলেন হরিপ্রভা, শ্বশুর-দেবর-ননদ-জা-শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের সকলেরই প্রাণভরা ভালোবাসা অনুভব করেছিলেন তিনি, আর যাঁর আন্তরিক স্নেহ তাঁকে অভিভূত করে দিয়েছিল, তিনি হরিপ্রভার শাশুড়ি। অল্পদিনের জন্য ঘরে আসা বধূটিকে যত্নে মায়ায় আর ভালোবাসায় ভরে দিয়েছিলেন তিনি, হরিপ্রভা কোনো কাজে এগিয়ে এলে সে কাজ তাকে 'সরাইয়া নিজে সমাধা করিতেন' তিনি, 'কম্বলাদি শীতবস্ত্রে' সযত্নে ঢেকে দিয়ে যেতেন হরিপ্রভার শীতার্ত শরীর, স্নানের সময়ে পরম যত্নে 'গাত্রমার্জনা' করে দিতেন বধূর। অল্প কয়েকটি ছত্রে, ছোট ছোট কয়েকটি তুলির টানে স্বদেশী পাঠকের সামনে ভিন্‌দেশী স্নেহশালিনী শাশুড়ির ছবিটি এমন উজ্জ্বল রঙে এঁকেছেন হরিপ্রভা। শাশুড়িকে ঘিরে পারস্পরিক ভালোবাসার অনুভবেই শেষ হয়েছে হরিপ্রভার ভ্রমণকথা, চার মাস পরে হরিপ্রভাকে বিদায় দিতে চোখের জলে ভেসেছিলেন তাঁর শাশুড়ি, বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা-র সমাপ্তিবাক্যে জানায়,

> বিদেশে এমন সরলস্বভাবা স্নেহপরায়ণা শ্বশ্রূঠাকুরাণীর মা'র মতো যত্ন ভালোবাসা পাইয়া ইঁহার সহিত বাস করিতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু সে সম্ভাবনা কোথায়?

হরিপ্রভার বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা পড়তে পড়তে মনে হয়, জাপানের একটা অন্তরঙ্গ মুখ আমরা দেখে নিতে পারি তাঁর কলমে, যে মুখের ছায়া ধরা দেয়নি সমকালীন রবীন্দ্রনাথের জাপানবাসের ইতিকথায়। বহিরঙ্গ জাপান তার প্রাণ নিয়ে ধরা দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের কলমে, আর জাপানের ভিতরমহলকে রূপ দিয়েছে হরিপ্রভার কলম, সদরে আর অন্দরে মিলে মিশে সমকালীন এই দুই জাপানবিবরণী আজকের পাঠকের জন্য হয়তো গড়ে দিতে পারে এক পরিপূরক পাঠ, এক পরিপূর্ণ জাপান-অন্বেষা।

হরিপ্রভার মতোই আরো এক বঙ্গনারী, হরিপ্রভারই সমকালিন স্বামীপুত্রসহ গিয়েছিলেন জাপানভ্রমণে। বিশিষ্ট সেই বঙ্গনারী সরোজনলিনী দত্ত, খ্যাতনামা তাঁর স্বামী গুরুসদয় দত্তও; সরোজনলিনীর জাপানভ্রমণকথাটি জাপানে বঙ্গনারী নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯২৮ সালে, একই সময়ে, ১৯৩৫ বঙ্গাব্দেই ধারাবাহিকভাবে

প্রকাশিত হতে শুরু করে 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকায়।

সরোজনলিনী জাপান গিয়েছিলেন ১৯২০ সালে, হরিপ্রভার প্রায় এক দশক পরে। ভিন্‌দেশের ভিন্নভাষার মেয়েদের জানবার আগ্রহ কম ছিল না সরোজনলিনীরও। যদিও, জাপানি মেয়েদের একটিকেও সুন্দরী মনে হয়নি সরোজনলিনীর চোখে, কিন্তু রূপ আকর্ষণ না করলেও, তাঁর মনোহরণ করেছিল তাদের গুণ। জাপানি মেয়েদের দেখতে দেখতে স্বদেশকে মনে না পড়ে পারেনি সরোজনলিনীর, মনে হয়েছিল,

> এদের মেয়েদের সঙ্গে আমাদের মেয়েদের তুলনা কর্‌লে, আমাদের যে কত শিক্ষার অভাব তা স্পষ্ট বুঝা যায়। আমার মনে হয়, সংযমই হচ্ছে এদের চরিত্রের একটী বিশেষত্ব। তা থেকেই এদের অন্য সব গুণের উৎপত্তি হয়েছে।

জাপানি মেয়েরা প্রায় সবাই শিক্ষিতা, কথাবার্তায় এমনটাই জেনেছিলেন সরোজনলিনী, তবে এ-ও খেয়াল করতে ভোলেননি উপনিবেশবাসিনী সরোজনলিনী,

> অবশ্য আমাদের দেশের ধারণায় ইংরাজি না জানলে শিক্ষা হয় না, কিন্তু এঁদের সে ধারণা নেই। খালি জাপানি ভাষাতেই এঁরা বেশি শিক্ষিতা হতে পারেন।

হরিপ্রভার মতোই জাপানি মেয়েদের হাই স্কুল দেখতে গিয়েছিলেন সরোজনলিনীও, স্কুল দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে যেতে প্রতি পদে দেশে ফেলে আসা আলোহীন মুখগুলির সঙ্গে তাদের তুলনা না করেও পারেননি। ১৯২০ সালে অবশ্য বাংলাদেশে বালিকাবিদ্যালয় নেই তা নয়, বেথুন-নিবেদিতা-রোকেয়া, সকলেরই উদ্যোগ সফল হয়েছে ততদিনে, বাংলাদেশের অন্যত্রও হয়েছে বালিকাশিক্ষার আয়োজন, কিন্তু সরোজনলিনী যে জাপানের সেই মেয়েদের হাইস্কুলে দু'চোখ ভরে দেখছেন,

> মেয়েদের ২০/২২ বৎসর বয়েসের আগে বিবাহ হয় না। সে জন্য ওরা ২০/২২ বৎসর বয়েসের পূর্ব্বে শিক্ষা সমাপ্ত করে না। এই জাপানি বালিকাদের দেখে আমাদের সুদূর ভারতবর্ষের সেই ছোট ময়লা বালিকা বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সেই ছোট ছোট রোগা শিশুগুলির কথা মনে হয়ে দেশের জন্য বড় কষ্ট হতে লাগল। আরও কত দিনে আমাদের দেশের লোক নারী-শিক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি করবে? কবে এমনি একাগ্র চিত্তে নারীদের শিক্ষা দিবে?... জাপানিরা কি সহজে আজ জগতে এত বড় স্থান অধিকার করেছে? এদের শিক্ষার কি গুণ! বালিকাগুলির মুখে কেমন প্রফুল্ল ভাব! আর তার সঙ্গে তাদের মুখে জ্ঞানের আলো যেন ফুটে পড়ছে মনে হয়।

এক-আধটি নন, নানান দিনে জাপানের নানা ধরণের একাধিক স্কুলে গিয়েছেন সরোজনলিনী আর তাঁর বুক জুড়ে বেজে উঠেছে নিজের দেশের শিক্ষাহীন ম্লান মুখ, কিয়োটো-র এক প্রাথমিক স্কুল দেখে সরোজনলিনীর মনে হয়েছে,

> জাপানকে দেখ্‌লে মনে হয় শিক্ষা পেলে আমরাও একদিন আমাদের অতীত গৌরব ফিরে পাবার আশা করতে পার্‌বো।...আমাদের দেশের পিতামাতারা জেগে উঠুন—পুত্র কন্যাদের শিক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করুন, তা হলে দেশের অভাব ঘুচ্‌বে। শিক্ষার জন্য এরা কত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় কর্‌ছে। আমাদের দেশে মেয়েদের শিক্ষার জন্য মাসে চারি আনা মাত্র বাপ মায়েদের কাছ হতে কষ্টে পাওয়া যায়; ঐ চার আনা দেবার ভয়ে কন্যা চিরদিন অজ্ঞান ও অশিক্ষিত থাকে। অনেক পিতামাতা মাসে এই সামান্য খরচ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য বলেন—"মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে কি হবে, সে কি চাক্‌রি করবে?" আমাদের দেশে শিক্ষা শুধু চাকরি পাবার আশায় দেওয়া হয়, জ্ঞান লাভের আশায় নয়! সেইখানেই হলো আমাদের গলদ্‌। যতদিন শিক্ষার মর্য্যাদা আমরা না বুঝব ততদিন আমাদের এই হীন পরাধীন অবস্থায় থাকতে হবে।

এত সৌন্দর্য অভিনবত্বের বিদেশী সফরসূচীর মাঝেও বারে বারেই সরোজনলিনীর মনে পড়ে গেছে তাঁর অসহায় স্বদেশভূমিকে, সিঙ্গাপুর হংকং সাংহাইয়ের পথে বহু বলিষ্ঠ শিখ ও পাঠান পাহারাওয়ালা দেখে প্রথমে তাদের স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্যে গর্বে বুক ভরে উঠলেও পর মুহূর্তেই বিষণ্ণতায় ডুবে গেছে তাঁর মন,

> আমরা ভারতমাতার কত অযোগ্য সন্তান দেশের বাইরে এসে মনে তা আরও বেশী রকমে উপলব্ধি করা যায়। মায়ের এমনি তেজীয়ান সন্তানগুলোও আজ বিদেশে এসে দাসত্ব কর্‌ছে! ভারতের লোক দাসত্ব ছাড়া বুঝি আর কিছু জানে না!

তবু, ভারতের দাসত্ব যত বেদনাই জাগাক, ইংরেজের দাম্ভিকতার প্রতিস্পর্ধী এক স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য হয়তো সরোজনলিনী খুঁজে পেয়েছিলেন জাপান, দেখেছিলেন পাশ্চাত্ত্যের বিপ্রতীপে প্রাচ্যের এক যোগ্য প্রতিভূকে, এইখানে এসে হয়তো একটা সুনির্দিষ্ট মাত্রা পায় তাঁর জাপানভ্রমণ, পাঠকের চোখ এড়ায় না, জাপানের কাছাকাছি পৌঁছেই সরোজনলিনীর চোখে পড়েছে,

> ইংরেজদের মনের ভাব আর বড় ম্লান বলে বোধ হলো। জাপানীদের স্বাধীনতা এঁদের কাছে ভাল লাগে না তা বেশ বুঝলাম। এরাও যে একটা বড় স্বাধীন জাত বোধ হয় এইটাই তাঁদের আঘাত করে। ভারতবর্ষে এঁদের সর্ব্বত্রই আধিপত্য, কিন্তু এখানে এঁরা কেউ নয়। এখন থেকেই তাঁদের ভাব-ভঙ্গি বদ্‌লে গেছে। সেই উগ্র ভাব অনেক নম্র হয়ে এসেছে।

বিশিষ্ট ব্রাহ্মনেতা শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা পরিচিত লেখিকা হেমলতা সরকারের নেপাল বিবরণী বা 'প্রবাসী' পত্রিকায় বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রকাশিত তাঁর তিব্বতবাসের ইতিকথার স্বচ্ছন্দ ভাবানুবাদটির কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যেতে পারে একালের কোনো কোনো পাঠকের। আর নেহাত অসঙ্গতও হবে না সে-মনে পড়াটা, কারণ হেমলতা সরকারের ভ্রমণকাহিনীগুলি যদিও প্রকাশের মুখ দেখেচে বিশ শতকে পা দেওয়ার পরেই, হেমলতা জন্মেছিলেন উনিশ শতকের মধ্য পর্বে, ১৮৬৮ সালে; হেমলতার নেপাল বিবরণী নেপালে বঙ্গনারী

প্রকাশ পেয়েছে ১৯১২ সালে আর জাপানী শ্রমণ একাই কাওয়াগুটি-র Three Years in Tibet বইটির স্বচ্ছন্দ অনুবাধ তিব্বতরাজ্যে তিন বৎসর 'প্রবাসী'তে প্রকাশের কাল ১৩২৪-২৫ বঙ্গাব্দ। দ্বিতীয় বইটি ভ্রমণকথাই, তবে হেমলতার -রচিত নয়, অনূদিত; আর, প্রথমটি হেমলতারই রচনা, তবে নেপালের বঙ্গনারী যত না এক বঙ্গনারীর ভ্রমণকথা, তার চেয়েও বেশি হয়তো তাঁর কলমে নেপালের পুরাবৃত্তকথা। যদিও শুরুতেই কাটমান্ডু পৌঁছনোর দুর্মমতার বিবরণে হেমলতা নামে বঙ্গনারীটির কলমের সরস নিপুণতার স্বাদ পেয়ে যান আগ্রহী পাঠক,

> ওঃ সে কি ভয়ানক পথ! যেন সোজা ভাবে উঁচু হইয়া উঠিতেছে। পথে না আছে গাছপালা না আছে আশ্রয়। পথও কি তেমনি? পা দিবা মাত্র নোড়া নুড়ি গড়াইয়া পড়িতেছে। কেবল ক্ষণে ক্ষণে ভয় হইতেছে বাহকগণ এইবার বুঝি আমাদের স্কন্ধে লইয়া গড়াইয়া তলায় পড়িয়া যায়। বাহকগণও গলদ্‌ঘর্ম্ম, অতি কষ্টে সাবধানে উঠেতেছে আর মুখে 'নারাণ' 'নারাণ' বলিতেছে।

মনে পড়ে যাচ্ছে আর একটি নাতিদীর্ঘ রচনার কথাও, বর্ম্মা-যাত্রা, প্রকাশ পেয়েছিল, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক, চৈত্র এবং ১৩৩৯ -এর শ্রাবণ মাসে, লেখিকা যার সরলা দেবী। স্বর্ণকুমারী দেবীর দ্বিতীয় কন্যা সরলা, জাতীয় জীবনের সরলা দেবীর উজ্জ্বলতর উপস্থিতি অনেকসময়েই ভুলিয়ে দেয় 'ভারতী' পত্রিকার অন্যতম যোগ্য সম্পাদিকা রূপে তাঁর ভূমিকা কিংবা ভুলিয়ে দেয় তাঁর সাহিত্যিক পরিচয়; সে-পরিচয়ের একটা আভাস হয়তো মেলে সরলা-র বর্ম্মা - যাত্রা নামে এই লেখাটিতে। বর্মার প্রাদেশিক হিন্দু কনফারেন্স-এর সভানেত্রী বিসেবেই বর্মায় এই যাত্রা সরলার, তাঁর সমুদ্রযাত্রার বর্ণনার সরসতায় কিন্তু নেত্রীর গাম্ভীর্যের ছায়া পড়েনি এতটুকু। সরলার কলম শুর হয়েছে এমনি এক বিবরণে,

> লাহোরের একজন মুসলমান গণৎকার একটি বাঙ্গালী মেয়ের হাত দেখে বলেছিলেন, ''এর সমুদ্রযাত্রা অবশ্যম্ভাবী।'' সকলে হেসে অস্থির! যা শতকরায় দেড়শখানা অসম্ভব, এমন একটা বাজে গণনা করলে কে না হাসবে? কিন্তু দেখতে দেখতে গণনা ফলে উঠল।

রেঙ্গুনে প্রবেশের মুহূর্তটি এমনি নিখুঁত রেখায়-রঙে এঁকে রেখেছে সরলা দেবীর নিপুণ কলম,

> ছবির মত উপকূলটি। এতদিন পরেও স্মৃতির নেগেটিভ থেকে সে ছবিখানি চোখের সামনে ফুটে ওঠে। সেদিন মানুষ ও দেবতায় মিলে দৃশ্যখানি এঁকে তুলেছিলেন। সেদিনও অন্যান্য দিনের মত ধরণীর পায়ের তলায় জলদেবী ইরাবতী তনুখানি এলিয়ে রয়েছেন বঙ্কিম ভঙ্গীতে, তাঁর দেহের বাঁকে বাঁকে তটের উপরেই মানুষের হাতের কারিগরিও তেমনি হয়েছে, সেগুলি বিদেশী সওদাগরেদের আপিস মাত্র হলেও আকারে প্রকারে সেখানকার প্রকৃতির সঙ্গে যেমন বেমানান হয়নি।...
>
> মানুষের হাত পেরিয়ে আকাশ যেখানে দেবতার হাতে পৌঁছেচে, সেই অন্তরীক্ষেই সেদিন কিন্তু আসল কারিগরি দেখলুম। কে এক চিত্রকর এমন তুলি হাতে সেখানটায় এঁকেছেন, দেখলে অবাক হতে হয়। বোধ হয় তিনি রোজই আঁকেন—সমতল বাঙ্গালায় আমাদের চোখে পড়ে না।

দু'দেশের সূর্যবর্ণনা এরপর এই ভাষায় রূপ নিয়েছে সরলা দেবীর কলমের তুলিতে,

> আমরা সূর্য্যোদয় দেখি যখন সূর্য্য আকাশে খানিকটা চড়েছেন, একখানা সোনার থালার মত। কিন্তু সেদিন যে সূর্য্য আঁকা দেখলুম, সে যথার্থই বালসূর্য্য, গালখানি টক্‌টকে শিশুর মত কোমল স্থির নির্ব্বাক দৃষ্টিতে ধরণীর প্রতি চেয়ে রয়েছে। আর নদীর দর্পণে নিজের মুখখানি দেখে বিস্ময় বিস্ফারিত হচ্ছে।

।। চার।।

ঘরের সীমানা ছাপিয়ে এত দূরে গিয়ে নয়, তবু ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া বাইরের পৃথিবীটাকে ছুঁয়ে আসার আনন্দটাই কি কম? আর সে-আনন্দ যারা পেয়েছে কখনো, আরো পাঁচজন পাঠকের সঙ্গে সেই আনন্দটা ভাগ করে নেওয়ার জন্য তাদের ইচ্ছেই কি কম? তাই, সেই প্রথম কালের মেয়েদের কলমের ভ্রমণকথা মানেই নয় বিলেতযাত্রা, জাপানভ্রমণ, নিদেন নেপালবাসের ইতিকথা, স্বদেশের টুকরো টুকরো পথের ছবিও কম দীপ্যমান হয়ে ওঠেনি তাদের কলমের ছোঁয়ায়।

আনন্দ আর উপভোগের স্বাদু মুহূর্তগুলোই তো টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে স্বদেশের পথে ভ্রমণের এই বৃত্তান্তগুলিতে। পরশাসিত এক দেশের মাটি থেকে এসে স্বাধীন দেশের খোলা হাওয়ায় শ্বাস নেওয়ার বেদনা আর আনন্দ বিষয় নয় এই সব স্বদেশেকথার, বৈভবে-দীনতায় এখানে বারে বারে মনে পড়ে যায় না ফেলে আসা স্বদেশ-স্বজনের মুখ, প্রতি পদে তুলনা আসে না মানে, আত্ম আর অপর-এর তত্ত্ব নির্মাণের কথাও মনে আসে না হয়তো আলোচকের, এসব ডুবিয়ে দিয়ে এইসব স্বদেশভ্রমণকথায় কেবল আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ।

মেয়েদের কলমের সে-সব ছবি স্বাদ নেওয়ার আগে বরং একবার ছিন্নপত্রাবলী-র পাতা মেলে ধরি মনোযোগী পাঠকের সামনে, আর একবার শুনিয়ে দিই তাকে প্রথম চিঠিতে যাত্রাপথের এই অনুপম বর্ণনাটি,

> সারা-ঘাটে স্টিমারে ওঠবার সময় মহা হাঙ্গামা। রাত্রি দশটা—জিনিসপত্র সহস্র, কুলি গোটাকতক, মেয়ে মানুষ পাঁচটা এবং পুরুষ মানুষ একটিমাত্র। নদী পেরিয়ে একটি ছোটো রেলগাড়িতে ওঠা গেল— তাতে চারটে করে শয্যা, আমরা...ছ'টা মনিষ্যি। মেয়েদের এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ladies' compartment-এ তোলা গেল—কথাটা শুনতে যত সংক্ষেপ হল কাজে ঠিক তেমনটা হয় নি। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি নিতান্ত অল্প হয় নি— তবু নদিদি বলেন আমি কিছুই করিনি।... অর্থাৎ, একখান আস্ত মানুষ একেবারে আস্ত রকম ক্ষেপলে যে রকমটা হয় সেইপ্রকার

মূর্তি ধারণ করলে ঠিক পুরুষ মানুষের উপযুক্ত হত। আমার ঠাণ্ডা ভাব দেখে নদিদি নিতান্ত disapointed। কিন্তু এই দু দিনে আমি এত বাক্স খুলেছি এবং বন্ধ করেছি এবং বেঞ্চির নীচে ঠেলে গুঁজেছি এবং উক্ত স্থান থেকে টেনে বের করেছি, এত বাক্স এবং পুঁটলির পিছনে আমি ফিরছি এবং এত বাক্স এবং পুঁটলি আমার পিছনে অভিশাপের মতো ফিরেছে, এত হারিয়েছে এবং এত ফের পাওয়া গেছে এবং এত পাওয়া যায়নি এবং পাবার জন্য এত চেষ্টা করা গেছে এবং যাচ্ছে যে, কোনো ছাব্বিশ বৎসর বয়সের ভদ্র সন্তানের অদৃষ্টে এমনটা ঘটে নি। আমার ঠিক বাক্স - phobia হয়েছে, বাক্স দেখলে আমার দাঁতে দাঁতে লাগে। যখন চার দিকে চেয়ে দেখি বাক্স, , কেবলই বাক্স, ছোটো বড়ো মাঝারি হাল্কা এবং ভারী, কাঠের এবং টিনের এবং পশুচর্মের এবং কাপড়ের— নীচে একটা, উপরে একটা, পাশে একটা, পিছনে একটা— তখন আমার ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি এবং ছুটোছুটি করবার স্বাভাবিক শক্তি একেবারে চলে যায়— এবং তখন আমার শূন্যদৃষ্টি শুষ্কমুখ এবং দীনভাব দেখলে নিতান্ত কাপুরুষের মতো বোধ হয়— অতএব আমার সম্বন্ধে নদিদির যা মত দাঁড়িয়েছে তা ঠিক...

উদ্ধৃতির আরো বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন, বাঙালি পাঠক মাত্রেই উনিশ শতকের এই সরস ভ্রমণবিবরণীটির সঙ্গে পরিচিত, তবু এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির কারণ ১৮৮৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দার্জিলিং থেকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই কৌতুকমাখা চিঠিটি কেবল রবীন্দ্রনাথের বিড়ম্বনার ছবিই ধরে রাখেনি, যাত্রাসঙ্গী হিসেবে বারে বারেই ফিরে এসেছে নদিদির মন্তব্য আর তার প্রতিক্রিয়া। এই ভ্রমণবৃত্তান্তের একটি নিজস্ব বয়ান ওই বিখ্যাত নদিদিটিরকলমেও ধরা আছে বইকি, দার্জিলিং পত্র নামে সে-লেখাটি রবীন্দ্রনাথের নদিদি স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছিলেন 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায়, প্রকাশ পেয়েছিল ১৯২৫ বঙ্গাব্দে বৈশাখ সংখ্যায়। রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি সৌদামিনী, নদিদি স্বর্ণকুমারী, স্বর্ণকুমারীর দুই কন্যা হিরণ্ময়ী ও সরলা, স্ত্রী মৃণালিনী আর শিশুকন্যা মাধুরীলতাকে নিয়ে এই যাত্রায় পথের সাথী 'পুরুষ অভিভাবকটি' সম্পর্কে প্রত্যাশিত সকৌতুক অভিমতই সে-লেখাতেও প্রকাশ করেছিলেন স্বর্ণকুমারী।

দার্জিলিং ভ্রমণের পরের বছরেই, ১৮৮৮ সালে আবারও রবীন্দ্রনাথের যাত্রাসঙ্গী হয়েই গাজিপুর ভ্রমণে গিয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, সে-ভ্রমণের আনন্দময় কিছু মুহূর্তও উজ্জ্বল হয়ে আছে স্বর্ণকুমারীর কলমে। গাজিপুর পত্র নামে এই ভ্রমণকথাটিও প্রকাশ পেয়েছিল 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায়, ১২৯৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ, ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায়। এ-যাত্রাতেও বিভ্রাটের অন্ত ছিল না, আর সস্নেহে কৌতুকে স্বর্ণকুমারী লিখেছেন, 'মহামারী ব্যাপারের মধ্যেও আমার ভায়াটা কাপুরুষের মতো অবিচলিত ভাবে' বসে আছেন, এ দেখে তাঁর সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়েছিল নির্বিকার রবীন্দ্রনাথের ওপরেই, স্বর্ণকুমারীর কলমে সে-বিড়ম্বনার একটা বর্ণনা এইরকম,

> তাঁহা হইতে কখনো যে ভারত উদ্ধার হইতে পারিবে না ইহা আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে লাগিলাম।...কিন্তু ভ্রাতার এমনি মনুষ্যচরিত্রজ্ঞান—তিনি বুঝিলেন আর একরকম। তিনি ভাবিলেন, পথশ্রমে আমি বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, কথাবার্তায় আমাকে তিনি উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিলেন।

কেবল দার্জিলিং কিংবা গাজিপুর নয়, এই দশকটিতে স্বদেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আর তা নিয়ে লেখালেখির বেশ কিছু পরিচয় ছড়িয়ে আছে স্বর্ণকুমারীর কলমে, অথচ জীবনের এই পর্বেই খুব কম ছিল না তাঁর কর্মব্যস্ততার আয়োজন, অব্যাহত ছিল তাঁর নিজের সাহিত্যচর্চা, সেই সঙ্গে ছিল নিয়মিত পত্রিকা সম্পাদনা আর সখিসমিতি-র কাজ, তবু পারিবারিক নানা ভ্রমণে সঙ্গী হয়েছেন স্বর্ণকুমারী, কখনো সঙ্গী রবীন্দ্রনাথ, কখনো যাত্রাপথ মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল অভিমুখে, কখনো বা মেয়ের একক সংসারে। স্বর্ণকুমারীর দ্বিতীয়া কন্যা স্বাধীনচেতা সরলা সারা জীবন নানা ক্ষেত্রে বারে বারেই অতিক্রম করে গেছেন গতানুগতিকতার বাঁধা পথ, ১৮৯৪ সালে তিনি মহারাণী গার্লস স্কুলে চাকরি নিয়ে মহীশূরে গেলেন সরলাকে সেখানে পৌঁছে দিতেও গেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী। আর স্বর্ণকুমারীর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথে কর্মস্থল ছিল সোলাপুর, ১৮৯০ আর ১৮৯২, দু'বছরে দু'বার সোলাপুর ভ্রমণেও গিয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী। তাঁর এই সোলাপুর ভ্রমণকথা স্থান পেয়েছিল ১২৯৮ বঙ্গাব্দের 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায়, দু'বছর আগের সোলাপুরের সঙ্গে পরবর্তী ভ্রমণের তুলনাও ধরা দিয়েছিল তাঁর সে-লেখায়, ১৮৯৫ সালে নীলগিরি যাবার জন্য সমুদ্রপথে যাত্রা করেছিলেন স্বর্ণকুমারী, আর ভ্রমণের এবারের অভিজ্ঞতাটি নানা ভাবে ধরা দিয়েছিল তাঁর কলমে; তাঁর এই ভ্রমণ - অভিজ্ঞতারই ফসল 'ভারতী' পত্রিকার ১৩০২ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় দেখা দিয়েছিল নীলগিরি নামে এক প্রবন্ধে আর মাঘ সংখ্যায় প্রকাশ পেয়েছিল নীলগিরির টোডা জাতি প্রবন্ধটিতে; ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত সমুদ্রে প্রবন্ধটি জুড়েও ধরা আছে তাঁর কলকাতা থেকে মাদ্রাজ; এই উপভোগ্য জাহাজ ভ্রমণেরই বিস্তৃত বিবরণ, জাহাজের স্বর্ণকুমারীর ছেলেমানুষিমাখা মুখটিকে উঁকি দিতে দেখি এইরকম এক বিবরণে,

> সাড়ে ছয়টায় দ্বিতীয় ঘন্টা বাজিতে নীচে আসিয়া দেখিলাম, পথে পথে ঘরে ঘরে বিদ্যুতালোকের জ্যোৎস্না। ধূম নাই, গন্ধ নাই, জ্বালাইতে নিভাইতে কোন জ্বালা যন্ত্রণা নাই, দীপসংলগ্ন ক্ষুদ্র কলদণ্ড উঠাও, দপ করিয়া সহসা জ্বলিয়া উঠিবে, নামাও, তৎক্ষণাৎ নিভিয়া যাইবে। সেদিন ক্যাবিনে আসিয়া কতবার যে আমি বিদ্যুৎ প্রদীপের কানটা উপর নীচে নাড়া দিয়াছিলাম তাহার ঠিক নাই। কলিকাতায় ঘরে ঘরে পথে পথে কবে এইরূপ বিদ্যুতালোক জ্বলিবে?

স্বর্ণকুমারী আর সরলা দেবী—এই দুই মা-মেয়ে কলমের পাশাপাশি ভেসে আসে আরো দুই বিখ্যাত মা-মেয়ে প্রসন্নময়ী দেবী আর প্রিয়ম্বদা দেবীর কণ্ঠস্বর। ১২৯৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশ পেয়েছিল প্রসন্নময়ী দেবীর আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা (প্রথম ভাগ), তীর্থযাত্রিণী প্রসন্নময়ীর চোখে ধরা দেওয়া উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশের

সুপরিচিত শহরের পরিচয় আর সেই সব স্থান, তাঁদের অধিবাসী আর আচার-আচরণ ঘিরে প্রসন্নময়ীর দৃষ্টিভঙ্গি ছড়িয়ে আছে তাঁর এই স্মৃতিচারণায়।

এক স্বাতন্ত্র্যময়ী পথিককে খুঁজে পাই তাজমহলের দর্শক প্রসন্নময়ীর মধ্যে, কত সুদীর্ঘ কাল ধরে যে সৌধ বিশ্বের মনোহরণ করছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে এই বঙ্গমহিলাটির মনে হয়,

> কিন্তু আমি তাজ দেখিয়া এত যে মোহিত হইয়াছিলাম, স্বর্গের স্বাপ্নিক মাধুরী যেন প্রস্তরে বিকশিত দেখিলাম বোধ হইল, —তথা আমি মনে করি, প্রকৃত অকৃত্রিম অপার্থিব পবিত্র প্রণয় এই সুন্দর মহান সমাধি-সৌধ তাজ অপেক্ষা সুন্দরতর, মহত্ত্বতর, ও অনন্ত সজীব। প্রকৃত এবং অমর প্রণয়ের গৌরবে অযুত অযুত তাজ নিমগ্ন ও বিলীন হইয়া যায়। সে প্রণয়ে নাস্তিক হৃদয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পরলোকে বিশাস, ব্রাহ্মে পৌত্তলিকতা এবং ইহাজীবনেই অনন্ত অক্ষয় জীবন্ত স্বর্গ আনয়ন করে ও যে প্রেমে দুই পৃথক আত্মা একত্রীভূত হইয়া পরমাত্মাতে শেষে সম্মিলিত হয়, ও একের অস্তিত্বে অন্য জীবন ধারণ করে, সে প্রণয়ের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য কোন পার্থিব সমাধির যে প্রয়োজন আছে, আমি ও তাহা বুঝিতে পারি না। একজনের মৃত্যুতে অন্য একজন জীবিত, ইহলোকেই যাহার জীবন্ত সমাধি হইয়া থাকে, সেই অপার্থিব প্রেমের অবিনশ্বর সমাধি স্থাপন এক অনন্ত বিভব নবে। তাজমহল স্বরূপ থাকে, সেই অপার্থিব প্রেমের অবিনশ্বর সমাধির স্থান এ অনন্ত বিভব নহে। তাজমহল স্বরূপ অলৌকিক সমাধিমন্দির দেখিয়াও তাহার অভ্যন্তরে চিরনিদ্রিতা সাজাহান প্রেয়সী মহিষীকে ''নারীকূলে ভাগ্যবতী'' কিম্বা ''পতি-সোহাগিনী' বলিয়া আমি মনে করি না।

যে সময়ে আর্যাবর্তে ভ্রমণ করেছিলেন প্রশন্নময়ী, উনিশ শতকের শেষ ভাগেই, তখনও উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ প্রদেশ বা শহরগুলিতে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার বা বাল্যবিবাহপ্রথার অবসান দেখতে পাননি তিনি, দেশ জুড়ে বিদেশে গিয়ে নয়, দেশের মাটিতে দাঁড়িয়েও, নতুন নতুন দেশ আর তীর্থ দেখার আনন্দ-উদ্দীপনার মধ্যেও মেয়েদের জীবনের এই কষ্টগুলি সঙ্গ ছাড়েনি তাঁর। এটোয়া পৌঁছে লিখেছেন প্রসন্নময়ী,

> স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়াত হিন্দুস্থানীরা এখনও যে আদৌ বুঝিতে পারে না। কখন কোন হিন্দুস্থানী বালিকাকে পাঠ করিতে আমি দেখি নাই কিম্বা শুনি নাই। আমি মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতা রমাবাই-এর দেশের কথা বলিতেছি না, স্মরণ রাখিবেন,

যদিও সচেতন ছিলেন প্রসন্নময়ী, বাংলাদেশেও 'স্ত্রীশিক্ষা কেবলমাত্র অঙ্কুরিত হইতেছে, আজও তাহার শুভফল চারিদিকে ব্যাপ্ত হয় নাই', তবু অনন্ত তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন অনেকেই, কেউ কেউ প্রয়াসীও হয়েছেন তার প্রসারে, 'কিন্তু হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে সে চেষ্টা প্রায়' নেই;

> তাহাদিগের অন্তঃপুরবাসিনীগণ অজ্ঞানে ঘোর তমসাচ্ছন্ন।

ঘরের মেয়েদের মুখ দেখে, বা ঘর ছেড়ে আভিনায় পা দিয়ে সে-দেশের মেয়েদের মলিন মুখগুলি দেখতে দেখতে এইরকম এক জোরালো সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছে যাত্রিক প্রসন্নময়ীর ভাবনাস্রোত,

> কি এই দেশে, কি বাঙ্গালায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ ও চেষ্টা আবশ্যক। আমাদিগের দেশে রাজনৈতিক উন্নতির জন্য যে রূপ চেষ্টা হইতেচে, তাহার অপেক্ষা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের অধিক চেষ্টা হওয়া অবশ্যক। আমাদিগের দেশের পুরুষগণ নিজের অন্তঃপুরের মুর্খতা, কুসংস্কার এবং অন্ধকার দূর করিবার কোন চেষ্টা না করিয়া বাহিরের ''দেশীয় উন্নতি'' 'দেশীয় উন্নতি'' বলিয়া চীৎকার করেন, তাহার জন্য অনেক সাহেব তাঁহাদিগকে ধিক্কার দেন, অনেক সময় দেশীয়গণকে এই ধিক্কারের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বোধ হয়।

আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা বইটি প্রসন্নময়ী উৎসর্গ করেছিলেন কন্যা প্রিয়ম্বদাকে। সেই প্রিয়ম্বদা দেবীরই লেখা ছোট্ট একটি বারাণসী ভ্রমণকথা মনে পড়ে যায় উত্তরকালে আগ্রহী পাঠকের, বারাণসী নামেই লেখাটি প্রকাশ পেয়েছিল 'ভারতী' পত্রিকার ১৩০৭ বঙ্গাব্দে ভাদ্র, আশ্বিন সংখ্যায়, বারাণসীধামের এক বিশ্লেষণী ছবি ধরা দিয়েছে প্রিয়ম্বদার সন্ধিৎসু মনের পটে, কাশীর ঘাট মুগ্ধ করেছে তাঁকে, 'শুক্লত্রয়োদশীয় জ্যোৎস্নাপ্রফুল্ল' রাতে নির্জন 'আলো-ছায়াঙ্কিত' পথে উপভোগ করেছেন 'কোথাও শুভ্র জ্যোৎস্নাধারা, কোথাও শ্যাম অন্ধকার' সেইসব মুগ্ধতায় ভরে উঠেছে তাঁর খাতার পাতার পর পাতার; কিন্তু বিশ্বনাথ-মন্দিরে পৌঁছে আরতি দেখতে বসে কখন বিকল হয়েছে মন, সমর্পণের সুর জাগেনি মনে, বিখ্যাত সেই আরতির ছবিখানি এইভাবে ধরা দিয়েছে প্রিয়ম্বদার কলমে,

> প্রতিমাসকল দশাশ্বমেধ ঘাটে বিসর্জ্জিত হইবে— সে বহুদূর, রাত্রি হইয়া গিয়াছিল, আমরা ফিরিলাম। উৎসবের আলো সমারোহ জনতা বাদ্য গীত হাস্য কলবর ক্ষীণতর হইয়া গেল— সঙ্গী রহিল আকাশের উজ্জ্বল চন্দ্র, ক্ষেপণীর ঐক্যতান উত্থান পতন শব্দ। ক্রমে একটি সুগোল গম্ভীর মিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। কথাগুলি স্পষ্ট নয়, কিন্তু মনে হইতে লাগিল যে অনুস্বরান্ত সংস্কৃত গাথা— সহযাত্রী একজন বলিলেন নিশ্চয়ই অদূর মন্দিরদ্বারে বসিয়া কোন সন্ন্যাসী সামগান করিতেছে। নৌকা গম্যস্থানে পৌঁছিল — সোপান বাহিয়া উপরে রাজপথে উঠিতেছি; আবার সেই কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল, এবারে আর কথাগুলি অস্পষ্ট নয়— ''চানাচোর গরমাগরম।''

প্রসন্নময়ী যদিও লিখেছিলেন, নিজের অন্তঃপুরের মূর্খতা, কুসংস্কার এবং অন্ধকার দূর করবার কোন চেষ্টা নেই আমাদের দেশে, রোকেয়া এঁকেছিলেন কূপমণ্ডূকের পথে বেরোনোর ছবি; তবু, মেয়েদের ঘর ছেড়ে বেরোনোর সেই ঊষাযুগেও যে-সব বঙ্গমলিারা ঘর হতে আঙিনা বিদেশটুকুতে পা রেখেছিলেন আর সে-রাখার স্বাদ ভাগ করে নিতে চেয়েছিলেন স্বকালের পাঠকের সঙ্গে, খুব সংক্ষিপ্ত নয় তাদের তালিকা; এখনই তো মনে পড়ে যায় গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, নিস্তারিণী দেবী, অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্ত, শতদলবাসিনী বিশ্বাস, কুমুদিনী খাস্তগিরের

মত আরো কত নাম। বিশেষত মনে পড়ে রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনকে, উনিশ শতকের বঙ্গমহিলার ভ্রমণকথাকে তাঁর চেয়ে উপযুক্ত নাম আর কে-ই বা দিতে পারত— কূপমণ্ডূকের হিমালয়দর্শন! আর তাঁর মতো কে-ই বা পারত সেই বেড়ানোর পথেও খুঁজে নিতে, অবলা যাদের নাম, তাদের চেয়ে সবল একজনও নেই সে-দেশ! কে পারত বেড়াতে বেড়াতেও এমন করে জানিয়ে দিতে, 'ভুটিয়ানীরা' তাদের 'উদরান্নের জন্য পুরুষের প্রত্যাশী' নয় একেবারেই, সমভাবেই সংসারের জন্য উপার্জন করে তারা; আর ওই যে অবলা আর সবলের প্রশ্ন? রোকেয়া জানিয়েছেন,

> বরং অধিকাং স্ত্রীলোকদিকেই পাথর বহিতে দেখি, পুরুষেরা বেশী বোঝা বন করে না। অবলারা পাথর বহিয়া লইয়া যায়, 'সবলে'রা পথে পাথর বিচাইয়া রাস্তা প্রস্তুত করে, সে কাজে বালক বালিকারাও যোগদান করে।...

।। পাঁচ।।

> প্রয়োজন না থাকিলে মানুষ অকস্মাৎ কেন বাহিরে যাইবে, এ প্রশ্নটা আমাদের দেশেই সম্ভব। বাহিরে যাইবার ইচ্ছাটাই যে মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এ কথাটা আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। কেবলমাত্র ঘর আমাদিগকে এত বাঁধনে এমন করিয়া বাঁধিয়াছে, চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইবার সময় আমাদের এত অযাত্রা, এত অবেলা, এত হাঁচি-টিকটিকি, এত অশ্রুপাত যে, বাহির আমাদের পক্ষে অত্যন্তই বাহির হইয়া পড়িয়াছে; ঘরের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।...বাঁধা ধাকিয়া আমাদের ডানা এমনি বন্ধ হইয়া গিয়াছে যে, উড়িবার আনন্দ যে একটা আনন্দ, এ কথাটা আমাদের দেশের বিশ্বাসযোগ্য নহে।...
>
> আমি গোড়াতেই বলিয়া রাখিতেছি, কেবলমাত্র বাহির হইয়া পড়াই আমাদের উদ্দেশ্য। ভাগ্যক্রমে পৃথিবীতে আশিয়াছি, পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করিয়া যাইব, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। দুইটা চক্ষু পাইয়াছি, সেই দুটা চক্ষু বিরাটকে যত দিক দিয়া যত বিচিত্র করিয়া দেখিবে ততই সার্থক হইবে।

বাংলা সাহিত্যের মনোযোগী পাঠকেরা সকলেই চিনতে পেরেছেন, পথের সঞ্চয় গ্রন্থে যাত্রার পূর্বপত্র প্রবন্ধে এই কথাগুলো শুনেছিলাম আমরা, রবীন্দ্রনাথের কলমে। আসন্ন ইউরোপ যাত্রার আগে বাহান্ন বছরের রবীন্দ্রনাথই যদি লেখেন এমন সব কথা, তবে কী করবে সেই সব মেয়েরা, সত্যিই ঘর হতে আঙিনা বিদেশ যাদের? উনিশ শতকের মেয়েদের লেখায় কতবার কত কারণেই ফিরে ফিরে আসে 'পিঞ্জর' শব্দ, সেইসব পিঞ্জরবাসিনীদের চেয়ে কে-ই বা বেশি জানে, ডানা মুড়ে বাঁধা পড়ে থাকতে থাকতে কেমন করে ভুলে যেতে হয়, ওড়বার আনন্দ একটা আনন্দ?

আর, ডানা মেলার একা আকাশ যখন সত্যিই খুলে যায় চোখের সামনে, তখন তাদের চৌকাঠের বাইরে পা বাড়াতে পারাটা তো কেবল অযাত্রা, অবেলা, হাঁচি-টিকটিকি আর অশ্রুপাতের সঙ্গে বুঝতে পারাই নয়, সে তো বাধার এক পাহাড় ডিঙিয়ে আসা। তবু তো প্রভেদ থাকে, কীসের সে প্রভেদ, শিক্ষার, রুচির, মনোভঙ্গির, নাকি সদর আর অন্দরের? প্রসন্নময়ী দেবী তাঁর আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা-র ভূমিকায় লিখেছিলেন,

> বঙ্গ মহিলার ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠকের কেমন লাগিবে তাহা জানি না।...পুরুষের পক্ষে যাহা যেরূপ দেখায় নারীর নেত্রে তাহা ঠিক সেইরূপ না দেখিতে পারে। সেই জন্য বঙ্গনারীর চক্ষে ও হৃদয়ে এই ইতিহাসময় আর্য্যাবর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন স্থান কি রূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল তাহা কেহ কেহ জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন এবং তাহা আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা বর্ণনা ও প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।

'নারীর নেত্রে' দেখা এই বঙ্গমহিলাদের ভ্রমণকথাগুলি, নারীর অনুভবে গড়া। ভ্রমণপথের রেখা ধরে চলতে চলতে স্বামীর অনুবর্তিনী হয়ে প্রথম মুখ খুলে কলের গাড়িতে ওঠবার মুহূর্ত থেকে প্রাদেশিক কনফারেন্সের সভানেত্রী হয়ে জাহাজে ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে একক যাত্রার অধিকার—কৃষ্ণভাবিনী দাস থেকে সরলা দেবী, সত্যি কি অনধিকার থেকে অর্জনে এসে পৌঁছল মেয়েদের জীবনের গল্প? ডানা আর পিঞ্জরের গল্প।